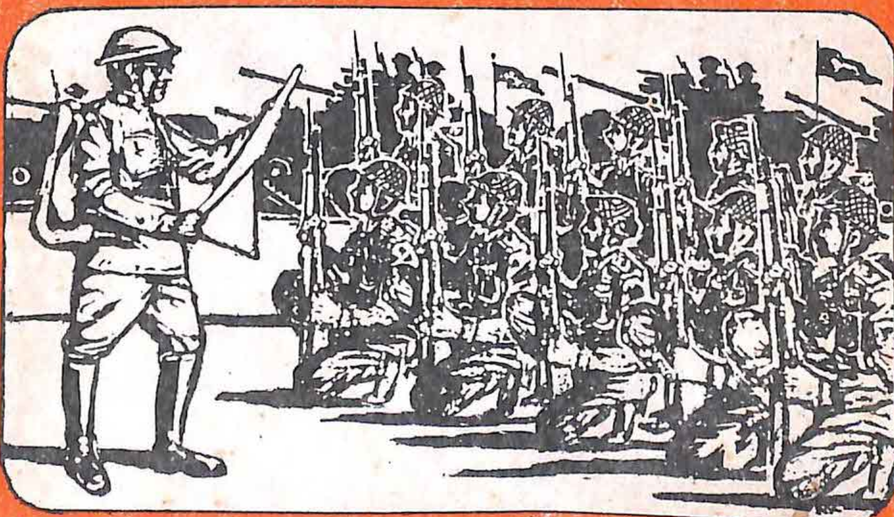


ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ



ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

পঞ্চম শ্রেণীর জন্য

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার

প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার

বিকাশ ভবন : সল্টলেক

কলিকাতা-৭০০ ০৯১

প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৯

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

সংশোধিত নতুন সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০০

(পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক সংশোধিত)

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

পর্ষদ-এর কথা

গ্রন্থটির ভাষা আরও সহজবোধ্য ও আলোচ্য বিষয় আরও তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য এই পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা যথাসম্ভব সরল এবং নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধ্যায়গুলির নামকরণ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি তাদের বিন্যাসেরও কিছু অদলবদল হয়েছে।

পাঠ্যসূচি অপরিবর্তিত থাকলেও পাঠ্যসূচি-প্রণেতাদের অভিপ্রায় অনুসরণে কয়েকটি অধ্যায়ে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকটির কলেবর সামান্য বেড়েছে।

গ্রন্থটির শেষদিকে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যগুলির উল্লেখ আছে। এগুলি ছাত্রছাত্রীদের জানার জন্য, মূল্যায়নের জন্য নয়।

গ্রন্থটি রচনায় ও অলংকরণে যাঁরা পর্ষদকে সাহায্য করেছেন পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৮৪, শরৎ বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সহায়তায় বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক ১৯৮১ সালে পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। পরবর্তী সময়ে পুস্তকটির একাধিকবার পরিমার্জিত সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হয়।

এবার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ একটি সময়োপযোগী নতুন সংস্করণ রচনা করেছে।

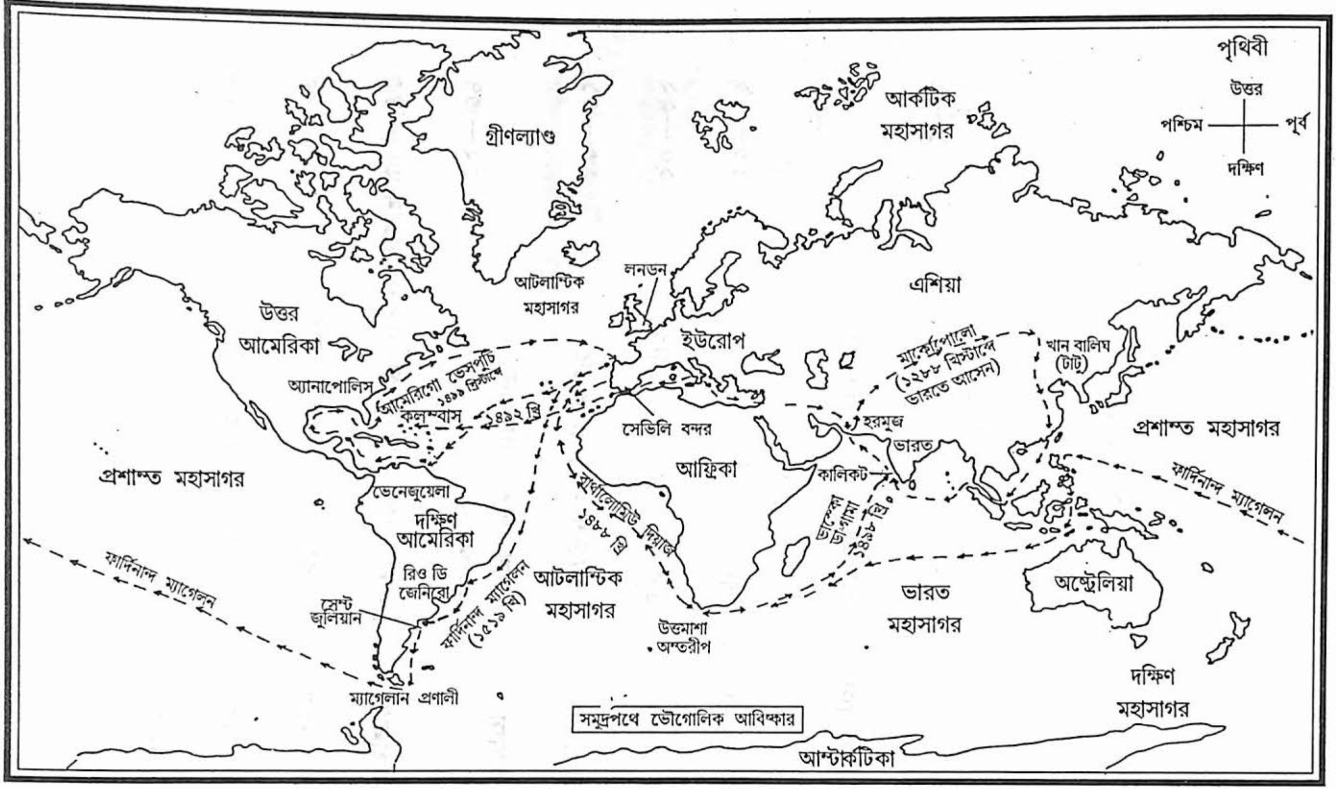
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই নতুন সংস্করণ পুস্তকটিও বিনামূল্যে বিতরণ এবং পাঠের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত হল। পুস্তক রচনা ও অলংকরণে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদসহ আরও যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তকটির উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

১১ জানুয়ারি ২০০০
বিকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০ ০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র



সমুদ্রপথে ভৌগোলিক আবিষ্কার

বাণিজ্যের প্রসার ও ভৌগোলিক আবিষ্কার

মানুষ কৌতূহলী জীব। তাই অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, অদেখাকে দেখবার ইচ্ছা তার চিরকালের। এই আকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে একদল দুঃসাহসী মানুষকে সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সব বিপদ তুচ্ছ করে নানারকম দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা দিয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের কয়েকটি দেশের বণিক-নাবিকরা অজানা সমুদ্রপথ ও নতুন দেশ আবিষ্কারের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এর ফলে যে সব ভৌগোলিক আবিষ্কার ঘটে সভ্যতার ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে নবজাগরণের ফলে মানুষের মনে নতুন করে জেগে ওঠা কৌতূহল ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য বেশ খানিকটা দায়ি ছিল।

মধ্যযুগ থেকে ভারত ও এশিয়ার অন্য দেশ থেকে মশলাপাতি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র আরব বণিকরা ইতালির ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি শহরে নিয়ে আসত। ইতালীয় বণিকরা সেইসব জিনিসপত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করত। ওই সময় থেকেই ইউরোপের লোকদের ইচ্ছা জেগেছিল কীভাবে প্রাচ্যদেশগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময়ে ইউরোপের সঙ্গে আরব দেশের বাণিজ্য আরও বেড়ে গেল। আরও বেশি অর্থ উপার্জনের লোভ জেগে উঠল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পিছনে এটাও ছিল একটা বড়ো কারণ। এর পর তুর্কিরা আরবদের হঠিয়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। তারা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টানটিনোপল অধিকার করে নিলে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যদেশে পৌঁছোনোর সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সমুদ্রপথে প্রাচ্যে পৌঁছোনোর চেষ্টা জোরকদমে শুরু হয়ে গেল। সেই সময়ে দূর সমুদ্র পাড়ি দেবার উপযুক্ত "দিগ্‌দর্শন" যন্ত্র বা কম্পাস তৈরি হল। এর ফলে এই বণিকরা ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে বহু দূরে মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তা ছাড়া, আরব বণিকদের এবং

দু-চারজন দুঃসাহসী ইউরোপীয় যুবকের নিকট থেকে তাঁরা ভারতবর্ষ আর চিনের অফুরন্ত ধনসম্পদের কাহিনী শুনলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির মার্কোপোলো ভারত আর চিন ঘুরে এসে লিখলেন তাঁর স্মৃতিকথা। তা পড়ে ইউরোপে বণিকদের বুকে জাগল দুরন্ত লোভ। কেমন করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওই বিপুল ধনসম্পদ তাঁরা দখল করবেন—এই চিন্তা তাঁদের পেয়ে বসল।

নতুন দেশের সন্ধানে

ইউরোপের বণিকদের উৎসাহ দিলেন পোর্তুগাল ও স্পেনের রাজা-রানিরাও। তাঁরা বুঝলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে গেলে বণিকদের সিন্দুক যখন ধনসম্পদে ভরে যাবে, তখন তারা বেশি করে রাজকর দেবে। তাতে তাঁদের রাজভাণ্ডারও পূর্ণ হবে। আর উৎসাহ দিলেন পোপ ও তাঁর পাদরি বা যাজকরা। তাঁরা ভাবলেন এই সুযোগে নতুন নতুন দেশে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পোর্তুগালের রাজকুমার হেনরিকে বিশেষভাবে প্রেরণা দেয়। রাজকুমার হেনরি (ইনি প্রিন্স হেনরি দ্য নেভিগেটর নামে খ্যাত) তাঁর দেশে নৌবিদ্যা শেখবার একটা ভালো বিদ্যালয় খুলে দিলেন। সেখানে জড়ো হলেন দেশের সেরা ভূগোলবিদ, মানচিত্র আঁকায় দক্ষ ব্যক্তি, আর নাবিকরা। রাজকুমার হেনরি তাঁদের উৎসাহ দিলেন বহুদূর সমুদ্রযাত্রায়।

প্রথমে তাঁরা খুব বেশি দূর যেতে সাহস পেতেন না। কিন্তু নাবিকদের ব্যবহারের জন্য কম্পাস আবিষ্কার, সমুদ্রে নৌ-চলাচলের জন্য উপযুক্ত ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি তৈরি হলে নাবিকরা দূর সমুদ্রে পাড়ি দিতে সাহসী হলেন। তাঁরা গেলেন ভূমধ্যসাগর থেকে বেরিয়ে, আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে। পৌঁছোলেন সেই দেশে যার এখনকার নাম অ্যাঙ্গোলা। সেখানে রাজ্য জয় করে বন্দুকের জোরে হাজার হাজার মানুষকে দাস করলেন। আর সেই দাসদের সাহায্যে, বুনো হাতি ফাঁদে ফেলে, লক্ষ লক্ষ টাকার হাতির দাঁত তাঁরা নিয়ে এলেন আফ্রিকা থেকে। এই সব হাতির দাঁত চড়া

দামে ইউরোপের রাজা, জমিদার আর ধনী অভিজাতদের মধ্যে বিক্রি করে তাঁরা বিরাটভাবে লাভবান হলেন।

ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

তাঁদের লোভ বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে সাহসও। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক **বার্থালোমিউ দিয়াজ** আরও দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলেন আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। প্রবল ঝড়ে তাঁর জাহাজ প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তাই তিনি জায়গাটির নাম দেন, "ঝড়ের অন্তরীপ"। কিন্তু সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেন সব খরচ-খরচার চেয়ে ষাটগুণ বেশি দামি জিনিসপত্রে জাহাজ বোঝাই করে। পোর্তুগালের রাজা তাঁকে খুব সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

ভাস্কো-ডা-গামা নামে আর এক পোর্তুগিজ নাবিক দিয়াজের অনুসরণ করা পথেই "ঝড়ের অন্তরীপে" পৌঁছোলেন। তিনিও ঝড়ের মুখে পড়েন। কোনও রকমে অন্তরীপটি পেরোনোর পরই ঝড় থেমে গেল। তাঁর মনে আরও এগিয়ে যাওয়ার আশা জাগল। তখন তিনি ওই অন্তরীপের নাম বদলে রাখলেন "উত্তমাশা অন্তরীপ"। সেখান থেকে এগিয়ে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছোলেন। সেটা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ।



ভাস্কো-ডা-গামা

ইউরোপ থেকে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হল। প্রায় নিয়মিতভাবেই ভারতে আসতে শুরু করলেন পোর্তুগিজরা। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম আর সপ্তগ্রামে, বোম্বাইয়ের কাছে গোয়াতে তাঁরা ঘাঁটি গাড়লেন। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বেপরোয়া লুটপাট চালাতেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের বলত "হার্মাদ" বা জলদস্যু।

পোর্তুগিজদের দেখাদেখি ইউরোপ থেকে এসে ফরাসি, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকরাও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাণিজ্য শুরু করল।

সমুদ্রপথে অন্যান্য আবিষ্কার

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পোর্তুগাল অগ্রণী হলেও ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলিও পিছিয়ে রইল না। ইতালির বণিক খ্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের রানি ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় চিনদেশে আসার জলপথের সন্ধানে বেরিয়ে নতুন মহাদেশ **আমেরিকা** আবিষ্কার করলেন। অবশ্য তিনি জানতেন না যে নতুন মহাদেশে এসেছেন। পরে আর এক ইতালির নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির নামে ওই মহাদেশের নামকরণ হয়েছে। স্পেনের ফার্দিনান্দ ম্যাগেলন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আসেন। ইংরেজ নাবিক ফ্রান্সিস ড্রেক সর্বপ্রথম জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন। এঁরা ছাড়া স্পেনের বালবোয়া ও কর্টেজ, ইংল্যান্ডের জন ক্যাবট ও সিবাস্টিয়ান ক্যাবট প্রমুখ অভিযাত্রীরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।



খ্রিস্টোফার কলম্বাস

উপনিবেশ গঠন ও ঔপনিবেশিক শোষণ

ইংরেজ বণিকরা ভারতে তাঁদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ দেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কিছুকাল ধরে ইংরেজদের সঙ্গে পোর্তুগিজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। ভারতে এসে

প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা আর আমাদের দেশের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষির সুযোগ নিয়ে তাঁরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জয় করলেন। ওই সময়েই দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশ ইংরেজদের দখলে আসে। তারপর ধাপে ধাপে গোটা ভারতবর্ষ তাঁদের দখলে এল। ভারতবর্ষ হল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ। দুহাতে লুট করলেন তাঁরা আমাদের দেশের কাঁচামাল, ধ্বংস করলেন আমাদের অনেকদিনের পুরোনো কুটিরশিল্প।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের বেপরোয়া শোষণে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তার নাম "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ / ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। তাতে বাংলাদেশ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়। খেতে না পেয়ে সাধারণ গ্রামবাসী মারা গেল। জমিজমা বেচে সর্বস্বান্ত হল আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। অথচ সেই বছরেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ শাসকরা নিষ্ঠুরভাবে জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করলেন। বাংলার তাঁত ও রেশম শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল।

আমাদের দেশ থেকে ইংরেজ শাসকরা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার ধনদৌলত লুট করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। সেই লুট করা ধনদৌলত ইংল্যান্ডের কলকারখানাতে খাটিয়ে ইংরেজ বণিকরা নিজেদের দেশে সবার আগে শিল্পবিপ্লব ঘটালেন। এইভাবে লুট করা ধন আর ঐশ্বর্যে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল ইংল্যান্ড।

ফরাসি বণিকরাও ইংরেজ বণিকদের মতো অত্যাচারী ছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজদের কাছে যুদ্ধে হেরে তাঁরা চলে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। সেখানে তাঁরা ধাপে ধাপে জয় করলেন ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়া। দেশগুলি একসঙ্গে ইন্দোচিন নামে পরিচিত হল। সেখানে চলল ফরাসিদের নির্মম শোষণ। ধানচাষের স্বর্ণভূমি ভিয়েতনামে শোষণের ফলে দেখা দিল ঘরে ঘরে হাহাকার, ভয়াবহ দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ। এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ইউরোপের বণিকরা সব জায়গাতেই দস্যুর ন্যায় আচরণ করে বর্বর নির্যাতন চালাতেন। একই চিত্র দেখা যায় স্পেনের

অধিকৃত মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে এবং পোর্তুগালের দখলে আসা ব্রেজিলে। আর ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান দখলের জন্য এক নির্লজ্জ নগ্ন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

শুধু তাই নয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই বিদেশি বণিকরা উপনিবেশগুলিকে ঠেলে দিয়েছিল অজ্ঞানতার অন্ধকার গহ্বরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাদরি অ্যাডাম তদন্ত করে জানান যে—ইংরেজ রাজত্বের আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে লেখাপড়ার চর্চা হত পাঠশালা আর মক্তবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কয়েক বছরেই শাসকদের অত্যাচারে সেগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামগুলিতে নেমে আসে নিরক্ষরতার অন্ধকার।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী বণিকরা উপনিবেশগুলির কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার সর্বনাশ করেছিল। দীর্ঘদিন লড়াই করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে একে একে স্বাধীন হয়েছে ভারতবর্ষ এবং অন্য সব উপনিবেশ।

অনুশীলনী

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

ভারত ও চিন ঘুরে কে স্মৃতিকথা লেখেন ?

মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য পথনির্দেশক যন্ত্রের নাম কি ?

পোর্তুগিজ নাবিকরা প্রথম আফ্রিকার কোন দেশে পৌঁছেছিলেন ?

কোন বছর আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয় ?

ভাস্কো-ডা-গামা কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন ?

জলপথে কে সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ?

ইউরোপের বণিকদের দূর দেশে পাড়ি দেওয়ার কারণ কি ছিল ?

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" কেন হয় ?

ফরাসিরা কোন্ কোন্ দেশ নিয়ে ইন্দোচিন গঠন করেন ?

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

ইউরোপে নবজাগরণের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। গতানুগতিকতা ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করে সত্যকে গ্রহণ করার প্রবণতা মানুষের মনে দানা বেঁধে যায়। সাহিত্য, শিল্প-স্থাপত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানও নবজাগরণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। যুক্তিবাদী অনুসন্ধানী মানুষ গবেষণার দ্বারা নতুন নতুন আবিষ্কার করলেন। এর ফলে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারই শুধু বাড়ল না, বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের জীবনকে আরও উন্নত এবং সুখকর করে তুলল।

নব নব জ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্মেষ ও বিকাশ

আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হল এ সময়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকন নামে ইংরেজ দার্শনিক হাতেকলমে কাজ করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তিনি সেগুলি যুক্তির দ্বারা বিচার ও পরীক্ষা করে তবেই গ্রহণ করতে বলেছেন। আতস কাঁচের আবিষ্কার তাঁরই। বেকন প্রচলিত ক্যালেন্ডার সংস্কারের প্রস্তাব দেন এবং বাতাসের চেয়েও হালকা উড়বার যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। ইউরোপে বারুদের ব্যবহার তাঁরই জন্য সম্ভব হয়। বারুদের আবিষ্কার ও লড়াইয়ের ময়দানে তার ব্যবহার আগের যুদ্ধরীতির পরিবর্তন ঘটায়। অনেকদিন আগেই তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের কথা চিন্তা করেছিলেন। যুগের অগ্রবর্তী সাহসী মতবাদের জন্য তাঁকে কারাগারেও পাঠানো হয়। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক অবদান রেখে গেছেন আলোকবিজ্ঞানে। তাঁর লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম 'ওপাস মেজুস'।

এর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে আবির্ভূত হন মনীষী স্যার ফ্রান্সিস বেকন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন—সব বিষয়ে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। তিনি বিজ্ঞানে নতুন পদ্ধতির সূচনা করেন। তাঁর লেখা অসংখ্য বইয়ের মধ্যে 'নোভাম অর্গানাম' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ইতালির লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি ছবি আঁকার জন্যই বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। যন্ত্রবিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনিই প্রথম শারীর স্থান বা শারীর বিদ্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন। লিওনার্দো এরোপ্লেন, সাবমেরিন, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক প্রভৃতির নকশা এঁকেছিলেন। এগুলি অনেক বছর পর আবিষ্কৃত হয়।

মধ্যযুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। প্রাচীন যুগে দু-একজন ভারতীয় এবং গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন যে এ সব ধারণা ভুল। আসলে, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু তাঁদের কথায় তখন কেউ কান দেয়নি। নবজাগরণের যুগে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা আবার সেই ধরনের কথা বলতে শুরু করলেন।


কোপারনিকাস

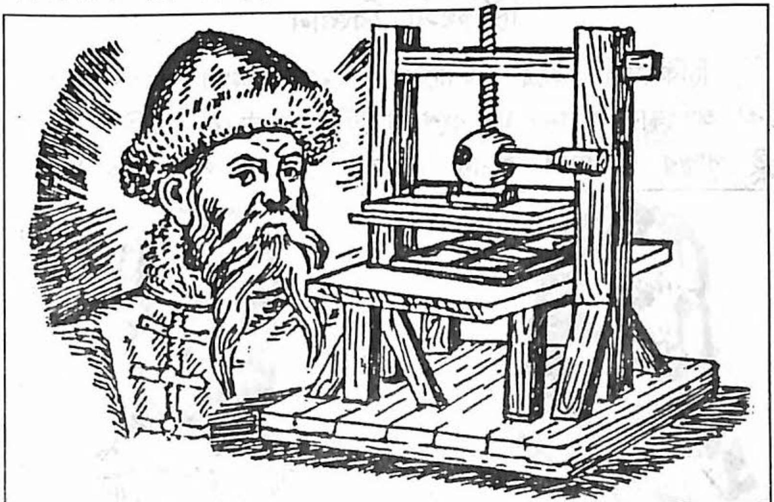
তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন কোপারনিকাস। পোলান্ডের মানুষ হলেও তিনি দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন ইতালিতে। জ্যোতির্বিদ্যা আর অঙ্কের অনেক হিসাব কষে তিনি ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এতে খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা ভীষণ চটে গেলেন। তাঁরা বললেন এ সব বাইবেল-বিরোধী অধার্মিক প্রচার। যাজকরা কোপারনিকাসকে যথেষ্ট হেনস্থা করেন।

কোপারনিকাসের মত প্রকাশের প্রায় ৫০ বছর পরে ইতালির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এক শক্তিশালী দূরবিন আবিষ্কার করেন। এই দূরবিনের সাহায্যে তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করে দিলেন


গ্যালিলিও

যে পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। যাজকদের প্রচার ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে গ্যালিলিওকে নানাভাবে নির্যাতন করেন। এঁদের সঙ্গে ওই যুগে আবির্ভূত জার্মানির কেপলার, ডেনমার্কের টাইকোব্রাহে প্রমুখ বিজ্ঞানীর নামও উল্লেখযোগ্য।

নবজাগরণের যুগের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছাপাখানার আবিষ্কার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা আবিষ্কার করেন জার্মানির গুটেনবার্গ নামে এক ব্যক্তি। জার্মান ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথার ল্যাটিন ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় বাইবেলের চমৎকার অনুবাদ করেন (১৫২০ খ্রিঃ)। সেই বই গুটেনবার্গের ছাপাখানা থেকে হাজারে হাজারে ছাপা হল। ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ওই দেশের ভাষাতে রচিত বই ছাপা হতে লাগল। সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞানের দরজা খুলে গেল। নবজাগরণ আর ধর্মসংস্কারের পথ সহজ হল।


যোহান্স গুটেন্‌বার্গ ও তাঁর ছাপাখানা

সপ্তদশ শতাব্দীতে জ্ঞান আর চিন্তার জগতে আলোড়ন দেখা দিল। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ঘটল এই সময়ে। ওই যুগের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রিঃ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সত্যটি আবিষ্কার করেন। হার্ভে নামে একজন বিজ্ঞানী মানুষের দেহে রক্তচলাচল কীভাবে করে, তা সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন। লন্ডনে স্থাপিত হল বিজ্ঞানচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র—রয়্যাল সোসাইটি এবং প্যারিসে ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি।


আইজাক নিউটন

জেমস্ ওয়াট্ আবিষ্কার করলেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। এই বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সব রকম কল চালাবার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। তারপর বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হয়। আর আজ পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার শিল্পে ও অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ডাক্তার জেনার বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা।


ডঃ জেনার


লুই পাস্তুর

রোনাল্ড রস কলকাতা শহরে গবেষণার দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করলেন পেনিসিলিন। এই পেনিসিলিন বহু রোগ চমকপ্রদভাবে প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে সক্ষম। বাঙালি বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেন ভয়াবহ রোগ কালাজ্বরের ঔষধ। এই সব আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি কঠিন রোগ আর মহামারী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে মানব সভ্যতার প্রভূত উপকার সাধন হয়েছে। পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম প্রভৃতি করাল ব্যাধির কবল থেকে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবনকে নিরাপদ করার বাস্তব সুযোগ এনে দিয়েছে বিজ্ঞানের নানা গবেষণা।

ধ্বংস না সৃষ্টি

কিন্তু পৃথিবীর কোনও কোনও দেশের মুষ্টিমেয় স্বার্থপর, লোভী মানুষ বিজ্ঞানের ও রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের মুঠোর মধ্যে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। বহু মানুষের সর্বনাশ করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। এই ধরনের মানুষরা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি নামে দুটি শহরে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষসহ শহর দুটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

আবার এর বিপরীতে, কোনও কোনও দেশে ওই পরমাণু শক্তিকেই মানুষের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উরাল নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে, মধ্য এশিয়ার কারাকুরাম মরুভূমিকে শস্যশ্যামল, প্রাণোচ্ছল অঞ্চলে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি মানব সভ্যতাকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে দেবে, না, ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করবে ? এ সব নির্ভর করছে মানুষের উপর, বিশেষভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

অনুশীলনী

১। **বলো দেখি :**

কোপারনিকাসের প্রধান বক্তব্য কী ছিল ?
ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলাফল কী হয়েছিল ?
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন ? এই আবিষ্কারের কী ফল হয় ?
হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :**

রোজার বেকন কী কী জিনিস আবিষ্কার করেন ?
লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি কীজন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন ?
গ্যালিলিও কী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ?

৩। **এক কথায় উত্তর লেখো :**

ছাপাখানা কে আবিষ্কার করেন ?
পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন কে ?
রয়্যাল সোসাইটি কোথায় অবস্থিত ?
জলাতঙ্ক রোগের টিকা কে আবিষ্কার করেন ?
বাঙালি বিজ্ঞানী কোন রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেন ?
মানুষের দেহের রক্তচলাচল কে ব্যাখ্যা করেন ?
ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন কে ?

শিল্প ও কৃষির প্রসার

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। ওই সময় থেকে ইউরোপের বণিকপ্রধান দেশগুলিতে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, শিল্পের নতুন নতুন আবিষ্কার হতে থাকে। এই সব আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ মহাদেশে প্রথমে ইংল্যান্ডের পরে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারা একেবারে বদলে যেতে থাকে। শুধুমাত্র চাষবাসের বদলে বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল। এতে অসংখ্য চাষী সব কিছু খুইয়ে গ্রাম ছেড়ে নতুন শহরগুলিতে ভিড় করতে লাগল। শহরের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে তারা বাস করতে থাকল আর নাম লেখাল কারখানার মজুর বাহিনীতে। জমিদার শ্রেণী তখনও সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, তবে তাদের ক্ষমতা অনেক কমে যায়। দেখা দিল এক নতুন শ্রেণী। এরা কলকারখানার মালিক। তারা শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে অনেক বেশি সময় খাটিয়ে নিত। কারখানায় তৈরি হওয়া জিনিসগুলি চড়া দামে সারা পৃথিবীতে বিক্রি করে বিপুল লাভ করতে থাকে।

নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রের আবিষ্কার এবং বাষ্পশক্তি ব্যবহারের ফলে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। ল্যাঙ্কাশায়ার আর ম্যানচেস্টার শহরের বড় বড় কাপড়কলের মালিকরা পৃথিবীতে বস্ত্রের বাজারের অর্ধেক দখল করে নিল। তখন ভারত ছিল ইংরেজদের অধীন। ঢাকায় তৈরি মসলিনের জগৎজোড়া সুনাম ছিল। বিলাতের কলকারখানায় প্রস্তুত জামাকাপড়, শাড়ি ভারতের বাজার এই সময় ছেয়ে ফেলল। সহজেই ইংরেজরা ভারতের প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করতে পারল। এইভাবে আমাদের শিল্পের সর্বনাশকে ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের ধনী কারখানার মালিকদের সমৃদ্ধি বাড়তে লাগল।

শিল্পের জন্য প্রয়োজন ছিল অফুরান কয়লা ও লোহা। প্রথমে দক্ষিণ ওয়েলস আর স্কটল্যান্ডে অনেক খনি খোঁড়া হল।[১] প্রথম প্রথম শ্রমিকদের প্রাণ হাতে করে খনিতে কাজ করতে হত। পরে খনিতে বাষ্পচালিত যন্ত্রের এবং বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভির আবিষ্কৃত "নিরাপত্তা বাতির" ব্যবহার খনির নীচে নেমে কাজ করার বিপদ খানিকটা কমিয়ে দিল। বিরাট আকারের এবং গভীর খনিগুলি থেকে লোহা কয়লা তোলায় অনেক অসুবিধা দূর হল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে লোহা, গলাবার বিশেষ ধরনের চুল্লি (ব্লাস্ট ফার্নেস) আবিষ্কৃত হলে লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। এই আবিষ্কারটি করেন জন স্মিটন।

নতুন নতুন যানবাহন

খনি থেকে কারখানা অঞ্চলে কয়লা তাড়াতাড়ি পাঠাবার আর কারখানায় তৈরি জিনিসপত্র বিদেশে চালান দেবার জন্য বন্দরে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন হয় দ্রুতগামী যানবাহনের। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের ক্লাইড নদীতে বাষ্পচালিত ছোট একটা জাহাজ সফলভাবে চালানো হল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্টিফেনসন্ আবিষ্কার করলেন বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা ইংল্যান্ডে ছেয়ে গেল রেলপথ। অল্পদিনের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্রুত রেলপথ স্থাপন হয়। সকল ঋতুতে যানবাহন চলাচলের উপযোগী বাঁধানো রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ বসানো হল।

---

[১] ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অনেকগুলি কয়লার খনি এবং লোরেনে লোহার খনি খোঁড়া হয়। জার্মানি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। স্যাকসনি, সাইলেসিয়া, রূর প্রভৃতি অঞ্চল খনির নিকটবর্তী হওয়াতে ওই সব স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজাদের সময়ে রাশিয়াতে লোহা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, রেল প্রভৃতি ভারী শিল্পের অনেক কলকারখানা স্থাপিত হয়। এই সব শিল্প আজকের পৃথিবীতে মানুষের প্রায় সব প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে। এক একটা দেশের সমৃদ্ধির মাপকাঠিই হচ্ছে সেই দেশের শিল্পোন্নতি।



ট্রেন চলতে শুরু করল কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোরে। বাষ্পচালিত সমুদ্রগামী জাহাজ বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত করতে লাগল, বন্দরের সংখ্যাও বেড়ে গেল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মোটরগাড়ি, বাস, লরি রাস্তায় চলতে শুরু করে। এর দশ বছরের মধ্যেই আকাশে উড়ল বিমানপোত। দূর আর দূর রইল না।

কৃষিকাজে আমূল পরিবর্তন

চাষবাসের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন এল। শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু কৃষিজাত ফসলের প্রয়োজন হয়। তাই কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বলদ বা ঘোড়া দিয়ে টানা লাঙলের জায়গায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর দেখা দিল। চিরাচরিত ব্যবহৃত গোবর বা পচাপাতা সারের জায়গায় এল রাসায়নিক সার।

মধ্যযুগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় গোড়ার দিক পর্যন্ত চাষবাস চলত বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ছোট জমিতে। ধনী ভূ-স্বামীরা ওইসব জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করে জমি হস্তগত করে নেয়। ইংল্যান্ডে ভূ-স্বামীদের সুবিধার জন্য আইন প্রণয়ন করাও হয়েছিল। ভূ-স্বামীরা বিরাট জায়গা জুড়ে বড়ো বড়ো খামার গড়ে তোলে। ওই খামারের চারপাশে বেড়া দেবার ব্যবস্থাও করে। আগে প্রথা ছিল জমিতে পরপর দুই বছর চাষ করার পর একবছর জমি পতিত রাখা হত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা দেখা গেল একই জমিতে প্রতি বছর একপ্রকার ফসল উৎপাদন না করে যদি বিভিন্ন বছরে আলাদা ফসলের চাষ করা যায় তাহলে জমি পতিত রাখার প্রয়োজন হবে না। এতে জমির উর্বরাশক্তি বজায় থাকবে। টাউনসেন্ড (ইনি ইংল্যান্ডের মন্ত্রীও ছিলেন) আবিষ্কার করলেন যে কয়েক বছর চাষের পর যদি শালগম, গাজর, মূলা প্রভৃতি ফসলের চাষ সেই জমিতে করা যায় তাহলে জমির উর্বরাশক্তি ফিরে আসে।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে উন্নত জাতের পশু প্রজননের দিকেও লক্ষ রাখা হয়। খাদ্যের জন্য কিছু পশুর মাংস ও পরিধেয় উষ্ণ বস্ত্রের জন্য পশমের প্রয়োজন। গবেষণার দ্বারা নতুন পদ্ধতিতে উন্নতমানের পশু প্রজনন সম্ভব হয়েছিল। ওই সকল আবিষ্কার কৃষিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়।

শিল্পবিপ্লবের ফল

শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনকেই ইতিহাসে বলা হয় শিল্পবিপ্লব। এই পরিবর্তন উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে তৈরি হওয়াতে জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে উন্নত হয়। আগের যুগের তুলনায় সমাজের অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ উন্নততর জীবনযাপনের সুবিধা লাভ করল। পূর্ববর্তীকালে যে সব বস্তু মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করতে পারত এখন সে সব সাধারণ

মানুষের আয়ত্তে এল। পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়ায় সকলের পক্ষে দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হল। সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিয়ো ইত্যাদি দ্রুত সংবাদ পাঠানো সম্ভব করল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হল। ওই সব দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মানের প্রচণ্ড উন্নতি ঘটল। কিন্তু সেই ধনদৌলত শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন কোটিপতি কলকারখানার মালিক ও বড়ো বড়ো জমিদারদের দখলে রইল। আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, উদয়াস্ত কলকারখানাতে ও খেত-খামারে মজুর বা খেতমজুর হিসাবে খেটে এই সব ধনদৌলত উৎপন্ন করেছে, তাদের ভাগ্যে জুটত যৎসামান্য মজুরি। এতে তারা দুবেলা পেটভরে খেতে ও দরকারি পোশাকটুকুও জোটাতে পারত না।

আর মালিক শ্রেণীর ঘরে রাত্রে যখন বিজলি বাতি জ্বলত, পাখা ঘুরত, তখন গরিব মজুর বা খেতমজুররা ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি হয়ে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে আলোবাতাসহীন পায়রার খোপের মতো ঘরে ঘুমোতে যেত। সেখানে বড়জোর টিমটিম করে লণ্ঠনের আলো জ্বলত।

শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে মজুর আর চাষীদের অনেক কিছুতে কোনও অধিকার ছিল না। অন্যায়ভাবে তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার চালানো হত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে চলত চাবুক, বেত, লাঠি, গুলি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল যে তারা দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবে না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পয়লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করব না বলে শ্রমিকরা মিছিল বের করে। মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। মিছিলের নেতাদের ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। আজও পৃথিবীর সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ পয়লা মে তারিখে তাঁদের স্মরণে 'মে দিবস' পালন করেন। ইউরোপ, আমেরিকার মতো দেশেই যখন শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের এই দুর্গতি, তখন ভারতের মতো পরাধীন দেশে যে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য অনেক বেশি ছিল এবং প্রতিবাদের প্রায় কোনও অধিকার ছিল না, তা না বললেও চলে।

অবশ্য এখন সারা পৃথিবীতে শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা অনেক বদলে গেছে। তাদের অধিকারও বেড়েছে। কোনও কোনও দেশে এদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এমনকী, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাতেও তারা অংশগ্রহণ করছে। আবার অন্য কতকগুলি দেশে তাদের অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। অনেক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে।

আজকের ভারত

ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশের অবস্থা এখনও উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। এর কারণ প্রায় দুশো বছরের বিদেশি শাসন ও শোষণের ফলে এ দেশের মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পশ্চাৎপদ অবস্থার চরম সীমায় পৌঁছেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরেও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দেশের অগ্রগতি এখনও আশানুরূপ হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে কলকারখানা অবশ্য বেড়েছে। দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা, বোকারো প্রভৃতি নতুন শিল্পনগর গড়ে উঠেছে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষই রয়েছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। দুবেলা ভরপেট খাবার তাদের আজও জোটে না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ চাইছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি।

অনুশীলনী

১। এক কথায় উত্তর দাও :

ইউরোপের শিল্পযুগের সূচনায় কারা গ্রাম থেকে শহরে এসে ভিড় করে ?

শিল্পের যুগে কোন শ্রেণীর ক্ষমতা কমে যায় ?

শিল্পের যুগে ইউরোপে কোন শ্রেণী ধনী হয়ে ওঠে ?

ঢাকায় তৈরি কোন কাপড় খুব খ্যাতিলাভ করেছিল ?

জমিতে লাঙল দেওয়ার জন্য ইউরোপে কোন নতুন যন্ত্র ব্যবহার হতে লাগল ?

ভারতে রেল চলাচল শুরু হয় কোন বছর থেকে ?

২। শূণ্যস্থান পূরণ করো :

১৮৮৬ সালে আমেরিকার ——— শহরে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল। প্রতি বছর ——— তারিখটি এখনও 'মে দিবস' হিসাবে পালন করা হয়।

৩। ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও :

(১) প্রথম বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন

(ক) হামফ্রে ডেভি

(খ) স্টিফেনসন্

(গ) জেমস্ ওয়াট্

(ঘ) উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(২) শিল্পযুগে মজুর ও কৃষকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল, কারণ

(ক) তারা স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাস করত,

(খ) ধনদৌলত কুক্ষিগত রইল কলকারখানার মালিকদের হাতে।

(গ) তাদের আট ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করতে হত।

(ঘ) তাদের শীতের রাতে গরম জামা কেনার পয়সা ছিল না।

৪। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

আধুনিক শিল্প সাধারণ মানুষের কী প্রকার উপকার করেছে ?

ইউরোপে শিল্পযুগে চাষী কলকারখানার মজুর বাহিনীতে পরিণত হল কেন ?

ভারতে শিল্পের সর্বনাশ কী কারণে ঘটেছিল ?

নিরাপত্তা বাতির ব্যবহারের ফলে কী সুবিধা হয়েছিল ?

শিল্পবিপ্লবের যুগে ইউরোপে চাষবাসের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ?

'শিল্পবিপ্লব' বলতে কী বুঝায় ?

'মে দিবস' পালন করা হয় কেন ?

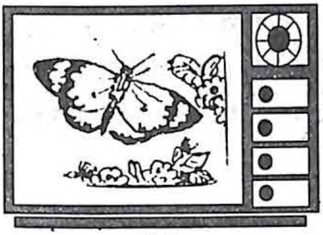
একালের যোগাযোগ ব্যবস্থা

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই ধীর গতির। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে গেলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত ঘোড়ার পিঠে চড়ে। রাজার কর্মচারী, রোগীকে বাঁচাতে বৈদ্য-কবিরাজ আর চিঠিপত্র নিয়ে কোনও ব্যক্তি—সকলকেই ওই একইভাবে যেতে হত। ডাকহরকরা চিঠিপত্র পৌঁছে দিত দৌড়ে দৌড়ে। এরপর কাঠের চাকা তৈয়ারি সভ্যতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। জলপথে যাতায়াতের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল কাঠের ভেলা। পরে এল নৌকা। ভারত থেকে পালতোলা জাহাজে করে চিনে বা ইউরোপে যেতে সময় লেগে যেত বেশ কয়েক মাস। ওই প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু গত দেড়শো বছরে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রম, আর যন্ত্রশিল্পের আবিষ্কারের ফলে এই অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। বলা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব ঘটে গেছে।

পৃথিবী চলে এসেছে ঘরের মধ্যে

বিদ্যুতের আলো আর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা যে সব দূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছোয়নি, সেখানে ছোট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো মারফত, দেশ আর দুনিয়ার সব খবর রোজ সকাল-সন্ধ্যায় পেতে পারেন সমস্ত মানুষ। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদি পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষের সঙ্গে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান করতে সাহায্য করছে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামে একটা টিভি সেট কেনা হলে, গ্রামের মানুষ পর্দায় দেখতে পান সেদিনের দেশ-বিদেশের খেলা ও নানা অনুষ্ঠান। দেশ-বিদেশের খবর, গান, বক্তৃতা ইত্যাদিও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান। নানা দেশের অনুষ্ঠানের সচিত্র খবর মুহূর্তের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। এই



টিভি

উপগ্রহের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খনিজ সম্পদেরও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস। এখন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে যাত্রী বা মালপত্র নিয়ে চলে ছোট ছোট ডিজেলচালিত স্টিমার। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, রেডিয়ো, সিনেমাযুক্ত বিশাল জাহাজ যা প্রায় ছোটখাটো শহরের মতো সেগুলি আজ অক্লেশে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে এই জাহাজ এক সপ্তাহে মুম্বাই থেকে ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে পাড়ি দেয়। বিমান সারা পৃথিবী ঘুরে আসে মাত্র দুই বা তিন দিনে।

এখন সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে কর্মস্থলে বা অন্য প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি যাতায়াত করেন বাসে বা ট্রেনে বা মোটর লঞ্চ ও স্টিমারে। কলকাতার মতো শহরে ট্রামে বা মাটির নীচের মেট্রো রেলে চেপে যাতায়াত করা যায়। পৃথিবীর দ্রুততম রেলগাড়ি চলে জাপানে মাথার উপর দিয়ে। তাকে বলে মোনোরেল। এর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার কিলোমিটার।

যোগাযোগের এই উন্নতির ফলে শুধু ধনীই নয়, সাধারণ মানুষও সহজেই যাতায়াত করতে পারেন আমাদের বিশাল দেশের বিভিন্ন অংশে। এর ফলে পরিচয় ঘটে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ, পোশাক, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। অনেক সহজে গড়ে ওঠে ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধ।

শুধু যাতায়াত নয়, খবর আদান-প্রদান করাও সম্ভব হয়েছে অনেক তাড়াতাড়ি। যেমন, ট্রানজিস্টার রেডিয়ো থাকায় সুন্দরবনের সমুদ্রতটের কাছের জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোবার আগেই জানতে পারেন যে আজ ঝড় উঠবে কিনা, সতর্ক হয়ে বাঁচাতে পারেন নিজেদের জীবন।

এইভাবেই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর যানবাহন ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি যুগান্তর এনে দিয়েছে পৃথিবীতে। দূর হয়েছে নিকট। নানা ভাষার, ধর্মের, বর্ণের আর জাতির বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থার মানুষকে এনে দিয়েছে কাছাকাছি।

অনুশীলনী

১। **এক কথায় উত্তর দাও :**

কোন যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলের খবরাখবর ঘরে বসে দেখতে পারি ?

কীভাবে আমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত যাতায়াত করতে পারি ?

কলকাতার মাটির নীচের রেলপথের নাম কী ? মনোরেল কোথায় চলে ?

২। **কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

কীসের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এসেছে ?

টিভি ও রেডিয়ো কীভাবে পৃথিবীকে ঘরের কোণে নিয়ে এসেছে ?

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে কীভাবে সহায়ক হয়েছে ?

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সুফল কী ?

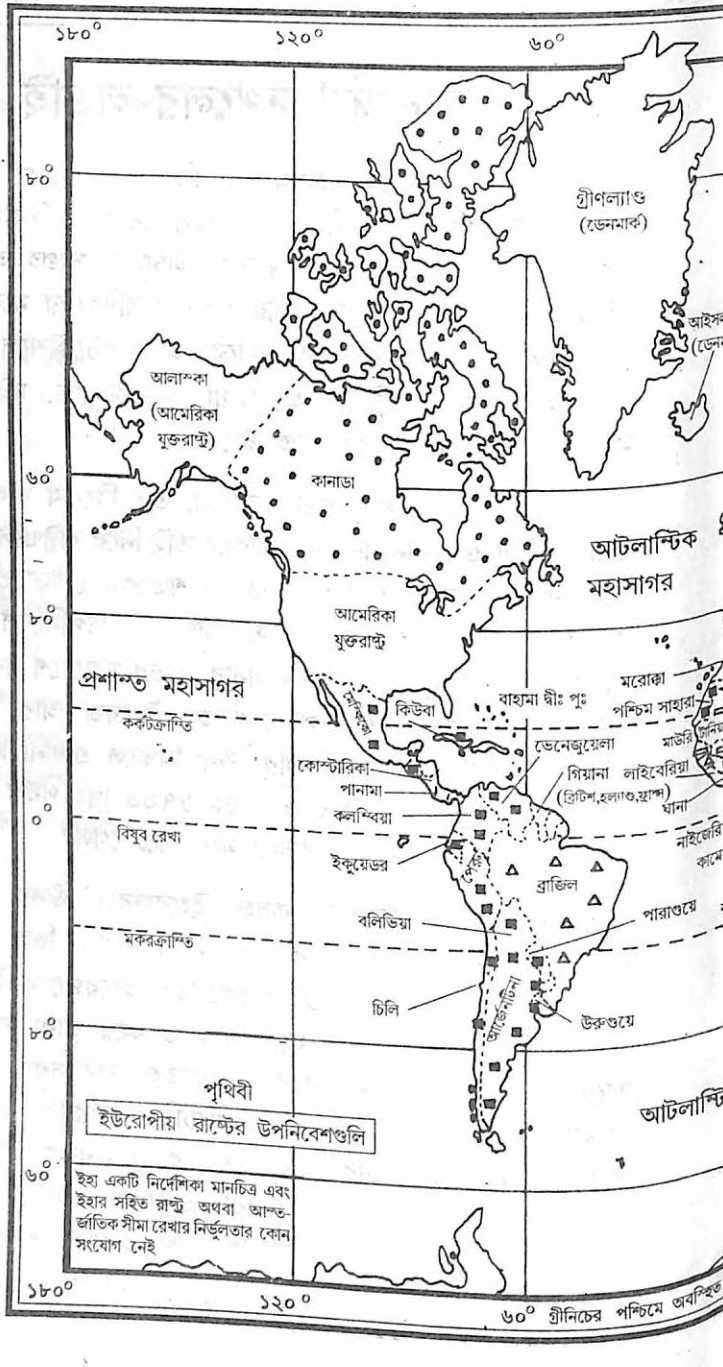
ভিনদেশ দখলের লড়াই

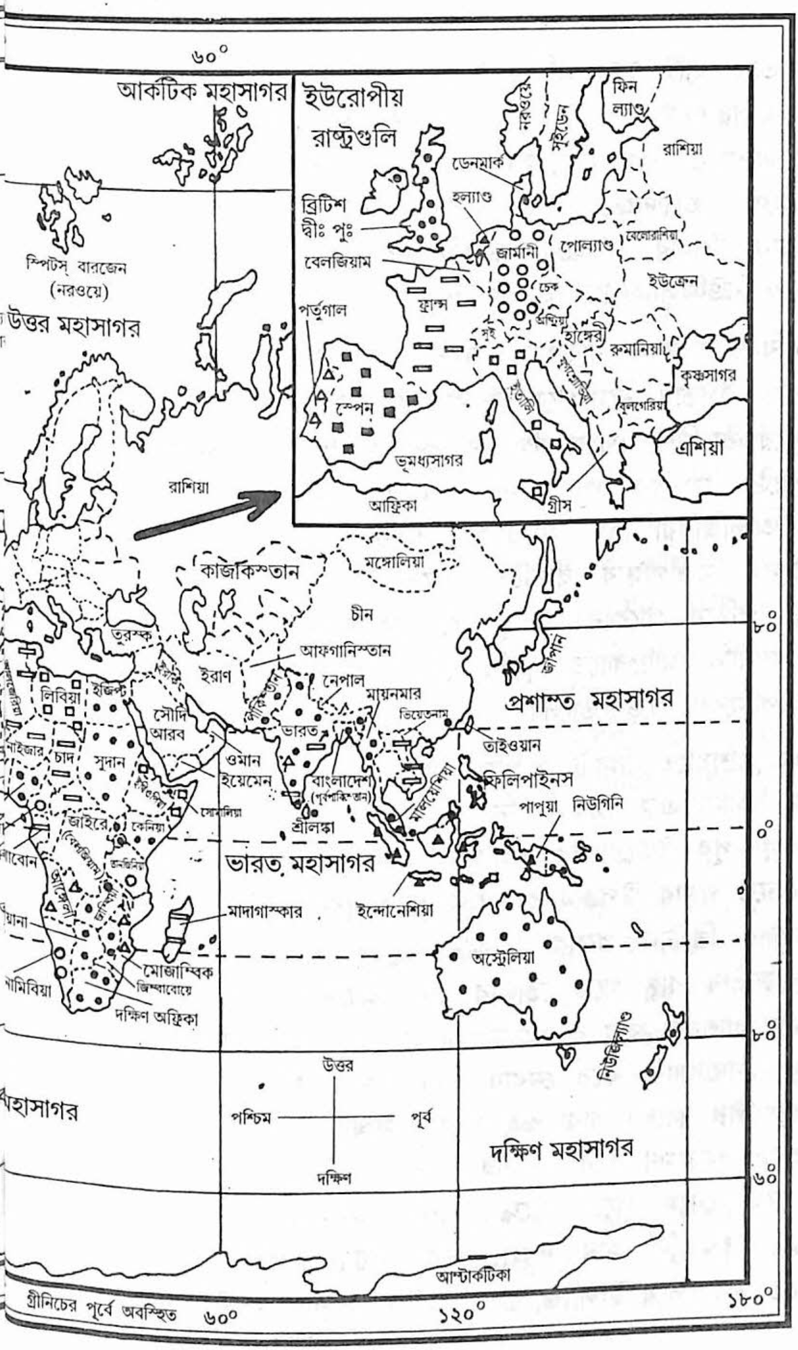
আমরা জেনেছি, মহাসমুদ্রের জলপথ আবিষ্কার করার পর ইউরোপের বণিকরা বেরিয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য করতে। সেই দেশগুলি থেকে অফুরন্ত কাঁচামাল সংগ্রহ আর সেখানে তৈরি সামগ্রী বিক্রির বাজার পেয়ে এই সব বণিকদের মনে জেগেছিল দুরন্ত লোভ। তারা বন্দুকের জোরে আর কূটকৌশলে উপনিবেশ গড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দুই আমেরিকা মহাদেশে আর মহাসাগরের বহু দ্বীপে।

তাদের লোভ যত বাড়তে লাগল, তত বিরোধ বাধতে থাকল। কার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বেশি থাকবে তাই নিয়ে রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হল। আঠারো শতকের গোড়াতেই স্পেনীয়, পোর্তুগিজ আর ওলন্দাজরা সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পিছু হটে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য, সবচেয়ে বেশি উপনিবেশ হল ইংরেজ আর ফরাসিদের। ভারতবর্ষ আর উত্তর আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে প্রাধান্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ তীব্র হল। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ খ্রিঃ পর্যন্ত "সপ্তবর্ষের যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে ঘটে গেল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করল ইংরেজরা। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তরে বিশাল কানাডা নামে দেশে ছিল ফরাসিদের উপনিবেশ। ১৭৬৩ থেকে তা পরিণত হল ইংরেজদের উপনিবেশে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা সারা ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের সূচনা করে। ভারতেও ফরাসিরা হেরে গেল ইংরেজদের কাছে। চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, কারিকল ও মাহে— ভারতের মাত্র এই চারটি ঘাঁটিতে কোনও রকমে টিকে রইল ফরাসিদের উপনিবেশ। পোর্তুগিজরা ভারতের গোয়া, দমন, দিউ নামে স্থানগুলিতে তাদের উপনিবেশ রক্ষা করতে পেরেছিল কারণ তারা আর এ দেশে দখল করার লড়াইতে নামেনি।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি




৬০°
আর্কটিক মহাসাগর
ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি
স্পিটস্ বারজেন (নরওয়ে)
উত্তর মহাসাগর
রাশিয়া
ব্রিটিশ দ্বীঃ পুঃ
বেলজিয়াম
পর্তুগাল
স্পেন
ফ্রান্স
ডেনমার্ক
হল্যাণ্ড
জার্মানী
পোল্যাণ্ড
চেক
অস্ট্রিয়া
সুই
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
ইতালি
গ্রীস
ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা
এশিয়া
কৃষ্ণসাগর
ইউক্রেন
বেলোরাশিয়া
ফিন ল্যাণ্ড
নরওয়ে
সুইডেন
রাশিয়া
কাজাকিস্তান
মঙ্গোলিয়া
চীন
তুরস্ক
আফগানিস্তান
ইরাণ
নেপাল
মায়নমার
ভিয়েতনাম
ভারত
সৌদি আরব
ওমান
ইয়েমেন
বাংলাদেশ (পূর্বপাকিস্তান)
শ্রীলঙ্কা
মালয়েশিয়া
তাইওয়ান
ফিলিপাইনস
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
পাপুয়া নিউগিনি
লিবিয়া
ইজিপ্ট
চাদ
সুদান
নাইজার
সোমালিয়া
কেনিয়া
জাইরে
তানজানিয়া
মোজাম্বিক
জিম্বাবোয়ে
দক্ষিণ অফ্রিকা
নামিবিয়া
মাদাগাস্কার
ভারত মহাসাগর
ইন্দোনেশিয়া
অস্ট্রেলিয়া
নিউজিল্যাণ্ড
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
দক্ষিণ মহাসাগর
মহাসাগর
আন্টার্কটিকা
৪০°
০°
৪০°
৬০°
গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত
৬০°
১২০°
১৮০°

ভারতকে ঘাঁটি করে এশিয়াতে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মাইনমার), মালয় (মালয়েশিয়া) প্রভৃতি দেশ দখল করে। আর ফরাসিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াতে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ওলন্দাজদের উপনিবেশ ছিল ইন্দোনেশিয়াতে। পোর্তুগিজরাও এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি দ্বীপ তাদের দখলে রাখে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আফ্রিকা মহাদেশ দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশ। দেখতে দেখতে ইংরেজরা মিশর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে ফরাসিদের সাম্রাজ্য গড়ে উঠল উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া থেকে সমগ্র মধ্য আফ্রিকা জুড়ে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার দ্বীপটিও তাদের দখলে ছিল। অন্য রাষ্ট্রগুলিও পিছিয়ে থাকেনি। পোর্তুগাল, বেলজিয়াম ইতালি আর সবশেষে জার্মানি আফ্রিকাতে লুঠের ভোজে যোগ দেয়। তারাও সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে।

মধ্য এশিয়াতে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল রাশিয়া। রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা এসে ঠেকল চিন, পারস্য এবং আফগানিস্তানের গায়ে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলে তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে। ওই অঞ্চলের খ্রিস্টান প্রজারা তুর্কিদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করে। একই সময়ে রাশিয়ার জার বা সম্রাটরা দুর্বল তুর্কি সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ- বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য প্রস্তাব দেয় ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির কাছে। তারা ওই প্রস্তাবে সম্মত না হলে রাশিয়া তুর্কি সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। বিভিন্ন বলকান জাতিগুলিও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। যুদ্ধে রাশিয়া জয়লাভ করে তুর্কি সাম্রাজ্যের কতকগুলি স্থান দখল করে নেয়। রাশিয়ার এতটা শক্তিবৃদ্ধিতে ভয় পেয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের চাপে

রাশিয়া অধিকাংশ বিজিত অঞ্চলগুলি তুরস্ককে ফিরিয়ে দেয়। বলকান অঞ্চলের ওই সঙ্কট থেকেই অনেকগুলি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এতেও বলকান সমস্যা মেটেনি। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ঘটল আরও দুটি যুদ্ধ। তারপর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রিঃ)।

অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করল। ওই অঞ্চলের রাজ্যগুলি নামে স্বাধীন হলেও, আসলে ছিল আমেরিকার অধীন। এশিয়ার কয়েকটি স্থানেও তাদের একই ধরনের উপনিবেশ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাপান এবং জার্মানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদেরও চাই উপনিবেশ। জাপানের দৃষ্টি পড়ল প্রতিবেশী বিশাল অথচ দুর্বল চিনদেশের ওপর। চিন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ) জাপান জয়লাভ করে চিনের কয়েকটি স্থান দখল করে। জাপান এরপর রাশিয়াকেও পরাজিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিঃ) পর্যন্ত জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের এই নীতি বজায় ছিল। জার্মানি গড়ে তোলে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং বিরাট নৌবহর। জার্মানরা জানাল যে তাদেরও উপনিবেশ চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশ বিস্তার এবং সেখানে শোষণ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে চমৎকার ভাষায় লিখেছিলেন :

"য়ুরোপের প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। এখন মুশকিল হইয়াছে জার্মানীর। তার ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে, অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গশগশ করিতেছে, সে বলিতেছে : আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে, আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাত পাই, তার পাত কাড়িয়া লইব।"

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র যে কোনও উপায়ে জার্মানিকে বাধা দেবে স্থির করল। ইউরোপের আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইউরোপ দুটি যুদ্ধশিবিরে বিভক্ত হল। এর একটি শিবিরে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া আর ইতালি, আর অন্যটিতে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া। যুদ্ধের জন্য অন্য কারণ থাকলেও প্রধানত কার দখলে কতটা উপনিবেশ থাকবে, কে কত বড়ো সাম্রাজ্যের মালিক হবে তাই নিয়ে বিবাদ, এতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ; যুদ্ধ চলেছিল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যুদ্ধের আগুনে পুড়ল সারা ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়া। মারা গেল এক কোটি মানুষ, মারাত্মকভাবে আহত হল প্রায় তার চারগুণ লোক। ধ্বংস হল অজস্র শহর আর গ্রাম। যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রবর্গ পরাজিত হল। পৃথিবী জুড়ে মা-বোন-স্ত্রীরা হুঙ্কার করে উঠল : কোথায় গেল আমাদের ছেলেরা, ভাইয়েরা, স্বামীরা ? দাবি করা হল : আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। যুদ্ধ থেকে ফেরা সৈনিকরা জানাল—শান্তি চাই ! যুদ্ধের শেষে প্যারিস শহরে বসেছিল শান্তির সম্মেলন। জার্মানির ভার্সাই শহরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় (ভার্সাই সন্ধি, ১৯১৯ খ্রিঃ)।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই, ১৯১৭-র নভেম্বর মাসে, রাশিয়াতে শ্রমিক-চাষীরা, লেনিন ও তাঁর বিপ্লবী বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লব করে জার শাসনের উচ্ছেদ করলেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন পৃথিবীর প্রথম শোষণমুক্ত শ্রমিক-চাষীর সোভিয়েত রাশিয়া নামক রাষ্ট্র। সোভিয়েত রাশিয়া প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জানাল : যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বোঝা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দেশকেই বহন করতে হবে। বলল পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

কিন্তু এই প্রস্তাবে সায় দিলেন না ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর আমেরিকার বিজয়ী রাষ্ট্রনায়করা। তাঁরা বললেন—পরাজিত জার্মানিই বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ি। তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। জার্মানির অনেক অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হল। ভেঙে দেওয়া হল তার

সেনাবাহিনী। আর, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল ক্ষতিপূরণের বোঝা।

পরাজিত জার্মানি তখন অসহায়। এ সব তাকে মেনে নিতে হল। ওই ব্যবস্থার ফলে জার্মানদের মনে জেগেছিল ক্ষোভ। পরবর্তীকালে এই বিক্ষোভকে কাজে লাগায় অ্যাডল্‌ফ্ হিটলার নামে একজন স্বৈরাচারী নেতা। এর ফলে আবার শুরু হয় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

জার্মানি ভার্সাই সন্ধিকে রাষ্ট্রীয় অপমান বলে স্মরণে রেখেছিল। আর তার সঙ্গে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলির ছিল বিশাল সাম্রাজ্য গড়ার লোভ ও পারস্পরিক ঈর্ষা। এরই বশবর্তী হয়ে হিটলারের জার্মানি জোট বাঁধল মুসোলিনির ইতালি আর জাপানের সঙ্গে। জাপানেরও তখন প্রচণ্ড লোভ এশিয়া মহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্য গড়ার। এর ফলে তাদের বিরোধ বাধল ইংরেজ, ফরাসি ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে—পৃথিবীকে কারা শোষণ আর লুণ্ঠন করবে তাই নিয়ে। বেধে গেল পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিঃ)। এবার যুদ্ধ হল জলে, স্থলে ও আকাশে। সারা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রের আঘাতে মারা গেল ৬ কোটি মানুষ, মারাত্মকভাবে আহত হল প্রায় ২০ কোটি লোক। অজস্র নগর, বন্দর, শহর, গ্রাম, সভ্যতার বহু কেন্দ্র ধ্বংস হল।

সেই যুদ্ধের আঁচ লেগে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হল (১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ) তাতেই মারা গেল ৫০ লক্ষ মানুষ।

জার্মানি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য রাশিয়ার মানুষরা প্রাণপণ লড়াই করে হিটলারের জার্মানিকে হারিয়ে দিলেন। রাশিয়া বলেছিল ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি চাই, পররাজ্য হরণ করা চলবে না। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জার্মানি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে ইউরোপে যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু জাপান

এককভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষদিকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা ভয়াবহ পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করল জাপানের হিরোসিমা আর নাগাসাকি শহরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হল শহর দুটি, আর ঝলসে মারা গেল লক্ষ নরনারী ও শিশু। জাপান নতি স্বীকার করল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা লাভের জন্য জোর লড়াই শুরু হল। এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তি অনেক কমে যায়। ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, তারপর বর্মা। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-ডং-এর নেতৃত্বে বিপ্লব জয়লাভ করল চিনদেশে। স্বাধীন হল ভিয়েতনাম, আরব জগৎ, দক্ষিণ অংশ বাদে আফ্রিকা। কিছুদিন আগে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা সব অধিকার আদায় করে নিয়েছেন। দুশো বছরের বণিক সাম্রাজ্যের অবসান হল ও শুরু হয়ে গেল জাতীয় মুক্তির যুগ।

অনুশীলনী

১। এক কথায় উত্তর দাও :

১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ ইতিহাসে কী নামে পরিচিত ?

ভারতবর্ষে কোন বিদেশি শক্তি সাম্রাজ্য স্থাপন করে ?

পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর কোন বিদেশি রাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল ?

বলকান অঞ্চল কোথায় অবস্থিত ?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে শান্তি সম্মেলন পৃথিবীর কোন শহরে বসেছিল ?

ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় কাদের মধ্যে ?

বিপ্লবী বলশেভিক দল কার নেতৃত্বে রাশিয়াকে শোষণমুক্ত করেছিল ?

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরকে কীসের সাহায্যে ধ্বংস করেছিল ?

সর্বপ্রথম কোন শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় ?

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের বিখ্যাত নেতা কে ?

২। উত্তর দাও :

পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল কেন ?

জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য তৈরি হল কেন ?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ইউরোপের কোন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে অগ্রসর হয় ?

ঊনিশ শতকের শেষদিকে জাপান কী নীতি গ্রহণ করে ?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল কী হয়েছিল ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রধান প্রধান কোন রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যোগদান করে ?

অ্যাডাল্‌ফ্ হিটলার কে ছিলেন ? তাঁর পরিকল্পনা কী ছিল ?

৩। মিলিয়ে নিয়ে বন্ধনীর মধ্যে বাম দিকের সঠিক সংখ্যাটি লেখো :

(১)	১৯১৪	( )	রাশিয়ার জনগণের মুক্তি
(২)	১৯১৭	( )	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু
(৩)	১৯৪৫	( )	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি
(৪)	১৯৪৭	( )	মহাচিনের স্বাধীনতা
(৫)	১৯৪৯	( )	ভারতের স্বাধীনতা

দেশে দেশে নবচেতনার বিকাশ ও উন্মেষ

স্বাধীনতা সব মানুষের, সব জাতির জন্মগত অধিকার। অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সমাজে সমান অধিকার চেয়ে এসেছে। একজন মাত্র রাজা বা দলপতির একচ্ছত্র শাসনের বদলে, সকলের মতামত শুনে তা মেনে চলার পক্ষে মানুষ বহু যুগ আগে থেকে মত প্রকাশ করে আসছে। এরই নাম গণতন্ত্র।

সভ্যতার একেবারে প্রথম পর্বে যে সময়ে রাষ্ট্র বা জাতি গড়ে ওঠেনি, তখন মানুষ থাকত ছোট ছোট গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে। তখন তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর শক্তিমান মানুষরাই দলপতি হত। পরে ধীরে ধীরে এই দলপতি পরিণত হল "রাজা"তে। রাজারা হয়ে ওঠেন অত্যন্ত শক্তিশালী। ওইসব শক্তিশালী রাজারা নিজেদের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতেন। সাধারণ মানুষের উপর চলত অত্যাচার নির্যাতন।

মানুষ দীর্ঘকাল ওই অত্যাচার সহ্য করেনি। নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য করেছে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। ঘটেছে বিপ্লব।

ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব

রানি প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'স্প্যানিশ আর্মাডা' (স্পেনের অজেয় নৌবহর) ইংরেজ নৌবাহিনীর দ্বারা ধ্বংস হয়। ইংল্যান্ডে আর বিদেশিদের আক্রমণের ভয় রইল না। তখন দেশের আইনসভা জনগণের হয়ে কয়েকটা দাবি জানালে রানি তা মেনে নিলেন। তাঁর পরের রাজা প্রথম জেমস কিন্তু আইনসভার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য চালাতে চাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়বদ্ধ, আর কারও কাছে নয়। অল্পদিনের মধ্যে রাজার সঙ্গে আইনসভার বিরোধ বাধে। এই বিরোধ চরমে পৌঁছোয় পরের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে। তিনিও মনে করতেন রাজা নিজের ইচ্ছামতো সব কিছু করতে পারেন।

আইনসভা তাঁর কথা মানতে না চাইলে তিনি আইনসভা ভেঙে দেন। রাজা ও আইনসভা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। শুরু হল গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রিঃ)। দেশের একদল মানুষ এই সময়ে নিজেদের বলতেন 'সমান অধিকার পন্থী'। মহাকবি মিল্টন ছিলেন তাঁদের পক্ষে। আইনসভার পক্ষে সেনাবাহিনী (নিউ মডেল আর্মি) পরিচালনা করেন অলিভার ক্রমওয়েল। রাজার সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। বিচার করে রাজা প্রথম চার্লসকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (৩০ জানুয়ারি ১৬৪৯ খ্রিঃ)। ক্রমওয়েল 'প্রোটেক্টর' উপাধি নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। তখন প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমসের শাসনকালে (১৬৮৫-৮৮ খ্রিঃ) পুনরায় নতুন করে রাজার সঙ্গে আইনসভার বিবাদ শুরু হয়।

গৌরবময় বিপ্লব

রাজা দ্বিতীয় জেমস আইনসভার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চাননি। তিনি ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং শুধুমাত্র রাজার ক্ষমতায় বিশ্বাসী। ধর্মের জন্যও দেশের বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গে রাজার বনিবনা হল না। দেশের সব উঁচু পদগুলিতে রাজা তাঁর অনুগামী ক্যাথলিকদের নিযুক্ত করেন। রাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে জনগণ মরিয়া হয়ে তাঁর জামাই প্রিন্স উইলিয়াম ও কন্যা মেরিকে রাজা ও রানি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। উইলিয়াম ইংল্যান্ডে এলে জেমস দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। বিনা রক্তপাতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ইতিহাসে এই ঘটনা গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রিঃ) নামে পরিচিত। আইনসভা উইলিয়াম ও মেরিকে ইংল্যান্ডের রাজা ও রানি হিসাবে সিংহাসনে বসায়। উইলিয়াম তৃতীয় উইলিয়াম নামে পরিচিত হন।

উইলিয়াম ও মেরি আইনসভায় পাশ করানো 'অধিকারের আইন' (বিল অব রাইটস) মেনে নেন। ওই আইন রাজার অধিকার ও

ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে রাজা যাতে সব ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে ওঠেন সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আইনসভা অর্থাৎ জনগণই হচ্ছে আসল ক্ষমতার মালিক এটা স্বীকৃত হল। ইংল্যান্ডে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় 'গৌরবময় বিপ্লব'-এর দ্বারা।

ফরাসি বিপ্লব

আঠারো শতকে একদল ফরাসি মনীষী প্রচার করলেন যে সভ্যতার আদি যুগে মানুষ ছিল স্বাধীন। রাজা ও অভিজাতরা ষড়যন্ত্র করে তাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় অত্যাচারী রাজাদের অনেকেরই দেশ শাসন করার মতো যোগ্যতা ছিল না। দেশের আর্থিক দুর্গতি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার উপর সমাজে ছিল ভীষণ বৈষম্য। সমাজের উপরতলার মানুষরা নানারকম বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করত। সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা ছিল না। ফরাসি দেশের গরিব চাষী ও মজুররা অনেকদিন উপরতলার মানুষদের অত্যাচার সহ্য করেছিল। এখন রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কু প্রমুখ মনীষীদের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মানুষ ওই সব অত্যাচারের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। শুরু হল ফরাসি বিপ্লব। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারিস্ শহরে গণবিপ্লব শুরু হয়। ওই দিন জনগণ অত্যাচারের প্রতীক 'বাস্তিল দুর্গ' ধ্বংস করে। রোবসপিয়ার, দাঁতো, ম্যারাট প্রমুখ ছিলেন বিপ্লবীদের প্রধান নেতা। কিছুদিন পরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়। রাজা ও রানির প্রাণদণ্ড হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজাতন্ত্র বা জনগণের শাসন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে নতুন তিনরঙা পতাকা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পেল। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল সারা পৃথিবীর উপর।


রুশো

রুশ বিপ্লব

রাশিয়ার সম্রাট বা জার ছিলেন অত্যাচারী। সুবিধাভোগী দেশের অভিজাতগণ ছিলেন সম্রাটের অনুগত। এঁরাও সাধারণ মানুষের উপর নানা রকম জুলুম করতেন। লেনিন ও তাঁর বিপ্লবী বলশেভিক দল প্রচার করলেন যে, অত্যাচার আর শোষণের মূল উপড়ে ফেলে মজুর, চাষী ও শোষিত মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়াতে সাধারণ মানুষরা বিপ্লব ঘটাল। জারের শাসন উচ্ছেদ করে মজুর-চাষীর স্বাধীন শোষণহীন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। ইতিহাসে একে বলে রুশ বিপ্লব। সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রের এক উজ্জ্বল আদর্শ সমস্ত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে যান এবং সেই সময়ে লেখেন, এখানে না এলে তাঁর বাকি থেকে যেত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শনটি।


লেনিন

চিন বিপ্লব

ভারতের মতো চিনদেশেও ইংরেজরা বাণিজ্য করতে যায়। ওই দেশে তারা প্রচুর পরিমাণে আফিম আমদানি করে। আফিমের নেশা চিনের মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনার উপক্রম করে। বিদেশি বণিকরা বাণিজ্যের নামে ওই দেশের সব সম্পদ লুণ্ঠন করতে লাগল। চিনের মাঞ্চু বংশের রাজারা ও জমিদাররা ছিল বিলাসী ও অত্যাচারী।


মাও-জে-ডঙ

রাজা, জমিদার ও বিদেশিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিনের মানুষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে। একে বলে "তাইপিং বিদ্রোহ"। বিদ্রোহীরা দাবি জানিয়েছিল জমিদারদের জমি দখল করে তা সাধারণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও গণশিক্ষা চালু করা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্থাপন করা, আফিম আমদানি বন্ধ করা ও দাসপ্রথার উচ্ছেদ করার দাবিও ছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে আর একটি বিদ্রোহ হয়। মাঞ্চু শাসনের অবসান ঘটিয়ে চিনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সারা চিনদেশে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চিনদেশের বিরাট অঞ্চলের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করে।

পরে মাও-জে-ডং-এর নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় দেশি ও বিদেশি অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাও-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী লালফৌজের "দীর্ঘ পদযাত্রা" (লং মার্চ) সারা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের পয়লা অক্টোবর "চিনা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। বলো দেখি :

প্রাচীন যুগে কে বা কারা রাজা হতেন ?

ইংল্যান্ডে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ কী ?

ফরাসি বিপ্লবে সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিলেন কেন ?

গৌরবময় বিপ্লব কী ? গৌরবময় বিপ্লবের গুরুত্ব কী ?

রুশ বিপ্লবের মূলকথা কী ছিল ?

চিনে প্রজাতন্ত্র কখন, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

২। এক কথায় উত্তর লেখো :

মানুষের জন্মগত অধিকার কী ?

ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের বিদ্রোহকে কোন কবি সমর্থন করেছিলেন ?

ফরাসি বিদ্রোহ কত খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল ?

ফরাসি বিপ্লবের একজন প্রধান নেতার নাম বল।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে কোন রাজবংশ রাজত্ব করত ?

রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে কোন ধরনের রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ?

৩। বাঁদিকের নামগুলির সঙ্গে ডানদিকের উত্তরকে ← চিহ্ন দিয়ে যোগ কর :

প্রথম এলিজাবেথ	প্যারিস
আর্মাডা	রাশিয়া
বলশেভিক	চিন
ফরাসি বিপ্লব	স্পেন
তাইপিং বিদ্রোহ	ইংল্যাণ্ড

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থানে বাক্যের পাশে বন্ধনীর ভিতরে দেওয়া বাক্যগুলির মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূর্ণ কর। একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

উদাহরণ : ফ্রান্সের <u>বাস্তিল</u> দুর্গটি ছিল অত্যাচারের প্রতীক। (ক্রেমলিন, বাস্তিল, নক্স)।

গৌরবময় বিপ্লব ঘটেছিল ——— খ্রিস্টাব্দ। (১৫৮৮, ১৬৮৮, ১৭৮৮)।

গৃহযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের আইনসভার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন ——— (অলিভার ক্রমওয়েল, রিচার্ড ক্রমওয়েল, প্রথম চার্লস)।

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ঘটেছিল ——— (জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা, দেশের দুর্গতি বৃদ্ধি, হল্যাণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি)।

——— ছিলেন রুশ বিপ্লবের প্রধান নেতা (লেনিন, স্ট্যালিন, দাঁতো)।

'লং মার্চ' পরিচালনা করেন ——— (সান-ইয়াত-সেন, মাও জে-ডং, চিয়াং কাইশেক)।

'লং মার্চ'-এর ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ ——— (ক্লান্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়)।

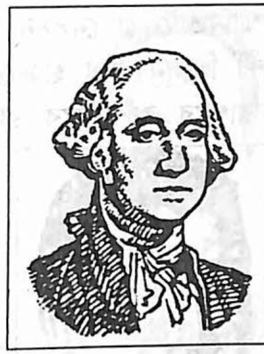
নানা দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম

এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলি ইউরোপের শক্তিশালী কয়েকটি রাষ্ট্র অধিকার করে নেয়। এই সব অধিকৃত দেশগুলিকে বলা হয় উপনিবেশ। পরাধীনতার প্রথম দিন থেকেই ওই দেশগুলিতে অসন্তোষ দেখা দেয়।

উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার লড়াই

আমেরিকা : ইংরেজরা প্রথমে উপনিবেশ গড়েছিল উত্তর আমেরিকাতে। সেখানে তাদের ছিল অনেকগুলি উপনিবেশ। সেখানকার মানুষ দেশ শাসনের ব্যাপারে কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও, ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো কিছু কিছু বিষয়ে ইংরেজদের স্বার্থে তৈরি নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হত। এ জন্য আমেরিকার মানুষজন ইংরেজদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের পর আমেরিকানদের উপর কয়েকটা নতুন কর বসানো হয়। আমেরিকানরা ইংল্যান্ডের রাজার কাছে এই কর তুলে নেবার জন্য আবেদন জানায়। ইংল্যান্ডের রাজা তা না মানলে আমেরিকার মানুষরা তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানকার স্বাধীনতাকামী মানুষরা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাদেলফিয়া শহরে সমবেত হন। সেখানে তাঁরা ঈশ্বর ও জনগণকে সাক্ষী করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের দেশ আর ইংরেজদের উপনিবেশ নয়, স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। তাঁদের নেতা প্যাট্রিক হেনরি উচ্চারণ করলেন—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু। আমেরিকানরা এই দিনটিকে এখনও স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল। স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকানরা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। অর্থবলে ও অস্ত্রবলে শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্যদের তাঁরা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকানরা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেন।



জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর প্রভাব পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। আমেরিকানরা তাঁদের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' (১৭৭৬ খ্রিঃ) স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে জনগণের মতই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে চূড়ান্ত।

স্পেনীয়রা ষোড়শ শতকে সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দখল করে নেয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রেজিল ছিল পোর্তুগিজদের অধীনে। তিনশো বছর পরে ফরাসি বিপ্লব আর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখানকার মানুষ সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শুরু করেন। এই সংগ্রাম শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে। একে একে এই অঞ্চলে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হয়।

আফ্রিকা : আজ থেকে চারশো বছর আগে আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলাতে পোর্তুগিজরা সর্বপ্রথম উপনিবেশ গঠন করেন। এখানকার কালো মানুষদের পরাধীন করা হয়। বহু দুঃখ, বেদনা আর আত্মদানের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়। তাঁদের নেতা অগাস্টিনো নেদো বলেছিলেন : 'তুলো, কফি আর ভুট্টা খেতের দেশ কালো মানুষের লাল রক্তে ভেজা, ক্ষতবিক্ষত। সুন্দর আমার দেশ—তোমাকে আমরা স্বাধীন করবই।' ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অ্যাঙ্গোলা পোর্তুগিজ দাসত্বের অবসান ঘটায় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। অগাস্টিনো নেদো স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলিও স্বাধীন হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা : দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের বহু বছর ধরে সেখানে বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে সমানাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই চালাতে হয়েছিল। তাঁদের সারা পৃথিবী জোড়া

সম্মানিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর নির্জন কারাগারে বন্দী ছিলেন। দশ হাজারেরও বেশি ১৪-১৫ বছরের ছেলেমেয়েকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বহু নরনারী প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসির দড়িতে। ভারতসহ অনেক দেশ নানাভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী মানুষদের সমর্থন জানিয়েছে। মহাত্মা গান্ধি দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ শাসকরা দেশের অধিকাংশ মানুষের থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিল। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সঙ্গে যে বৈষম্য ও অন্যায় ব্যবহার শাসকেরা করত, গান্ধিজি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করেন। তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ওই লড়াইয়ে অনেক ক্ষেত্রে তিনি সফলও হন। আজ সেখানকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটেছে। কালো মানুষদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন।

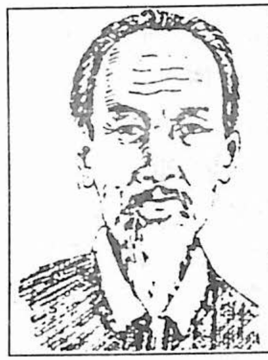


নেলসন ম্যাণ্ডেলা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ভিয়েতনাম : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 'রেড রিভার' অববাহিকায় ভিয়েতনাম নামে ছোট্ট দেশটির অবস্থান। সারা দেশ জুড়ে আছে ধানখেত, আর অগণিত দরিদ্র চাষী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসিরা এই দেশটি অধিকার করে নেয়। প্রথম দিন থেকেই ভিয়েতনামের মানুষ স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। ষাট-সত্তর বছর ধরে তারা ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারপর জাপান এই দেশটি দখল করে নেয়। জনসাধারণ সশস্ত্র গণবিপ্লবের দ্বারা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে


হো-চি-মিন

জাপানি শাসনের উচ্ছেদ ঘটাল। অস্থায়ী ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। রাষ্ট্রপতি হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হো-চি-মিন।

ফরাসিরা সহজে তাদের পুরনো উপনিবেশ ছেড়ে দেয়নি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারা পালটা অভিযান চালিয়েছিল। দীর্ঘ আট বছর ভিয়েতনামের পাহাড়ে-জঙ্গলে তীব্র লড়াই চলে। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে (১৯৫৪ খ্রিঃ) জেনারেল গিয়াপের অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য ফরাসিরা ভীষণভাবে পরাস্ত হয়। জেনেভা সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়।

এই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে ঢুকে পড়ে। তখন তাদের বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ একযোগে মুক্তিযুদ্ধে নামে। সেই যুদ্ধ একটানা ২০ বছর ধরে চলে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মুক্ত হয়ে উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব জায়গাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং ওই উপনিবেশগুলি দখল করে নেয়। যুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের উপনিবেশ ফিরে পায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওইসব দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে সফল হন। স্বাধীন হয় ওই অঞ্চলের জনগণ।

সুবিচার ও সমানাধিকার অর্জনের সংগ্রাম

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি পৃথিবীতে সব সময়েই সমানাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ধনী বাগিচা মালিকরা তুলোর চাষ করত। এই

চাযের কাজে বহু সংখ্যক নিগ্রো ক্রীতদাসদের তারা নিযুক্ত করত। শ্বেতাঙ্গ দাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে জোর করে কালো মানুষদের ধরে এনে আমেরিকার হাটে-বাজারে জন্তু-জানোয়ারের মতো বিক্রি করত। মুক্তি পাবার জন্য ক্রীতদাসগণ অনেকবার বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হয়েছে। জন ব্রাউনের মতো কিছু শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ক্রীতদাসদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। দাস ব্যবসায়ীরা তাদের গুলি করে হত্যা করেছে অথবা ফাঁসি দিয়েছে। নিগ্রোদের লোকসংগীতে দাস-মুক্তিসংগ্রামের এই বন্ধুরা চিরকালের জন্য স্থান পেয়েছেন। পৃথিবীর সব দেশেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, মজুর-কৃষক প্রভৃতি চিরকাল বঞ্চিত থেকেছেন। বহু লড়াই করে তবেই মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তাঁরা অর্জন করেছেন। তাঁরা কেউ নিরক্ষর থাকবেন না—এই সংকল্প নিয়েছেন। শিক্ষার জন্য তাঁদের লড়াই চলছে।

অনুশীলনী

১। এঁরা কে, কোন দেশের মানুষ, কী জন্য বিখ্যাত তা কয়েকটি বাক্যে লেখো :

প্যাট্রিক হেনরি, সাইমন বলিভার, অগাস্টিনো নেদো, নেলসন ম্যান্ডেলা, জন ব্রাউন, হো-চি-মিন, জর্জ ওয়াশিংটন।

২। নীচের কথাগুলি কে কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন লেখো :

হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

তুলো, কফি আর ভুট্টা খেতের দেশ কালো মানুষের লাল রক্তে ভেজা, ক্ষতবিক্ষত। সুন্দর আমার দেশ—তোমাকে আমরা স্বাধীন করবই।

৩। কয়েকটি বাক্যের সাহায্যে লেখো :

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান কারণ কী ছিল ? আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব কী ?

কোন কোন বিদেশি শক্তি ভিয়েতনাম দখল করেছিল ?

দক্ষিণ ভিয়েতনাম কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছিল ?

দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা কেন লড়াই করেছেন ?

৪। দুই এক কথায় উত্তর দাও :

কোন দিনটিকে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয় ?
আমেরিকার স্বাধীনতাকামী মানুষরা কোন শহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ?
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের নেতৃত্ব দেন কে ?
অ্যাঙ্গোলা কোন মহাদেশে অবস্থিত ?
ভিয়েতনামে কত বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছিল ?
ভিয়েতনামে ইউরোপের কোন দেশের উপনিবেশ ছিল ?
'দিয়েন বিয়েন-ফু'র যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল ?
নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর ধরে কারাগারে বন্দী ছিলেন ?

৫। **নিম্নলিখিত দেশগুলি কোন মহাদেশে অবস্থিত, উল্লেখ কর :**

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলা, ভিয়েতনাম।

৬। **সময়ের ক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সাজিয়ে খাতায় লেখ :**

অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা অর্জন করে।
উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ করে।
দিয়েন-বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজয় বরণ করে।
ইংরেজরা আমেরিকানদের উপর নতুন কর বসালে আমেরিকায় অসন্তোষ শুরু হয়।

ভারতে নবচেতনার বিকাশ

ভারত এক সময়ে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ছিল। পরবর্তী সময়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় ভারত অনেক পিছিয়ে পড়ে। সমাজ মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে ইংরেজ শাসন শুরু হয়। ইংরেজ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে নানা ছলেবলে ভারতের স্বাধীনতা হরণ করে।

ভারতীয় মনীষীরা ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। দেশের অধঃপতিত সামাজিক অবস্থা তাঁদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কার না হলে দেশের দুর্দশা ঘুচবে না। তাঁদের নিরলস চেষ্টার ফলে ভারতে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে।

রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিঃ)

নবজাগরণের মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্মরণীয় নাম রাজা রামমোহন রায়ের। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম (১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রিঃ)। এ দেশে প্রচলিত নানা রকমের কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তিনি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর এক। রামমোহন ছিলেন পৌত্তলিকতার অর্থাৎ মূর্তিপূজার বিরোধী। তাঁর চোখে সব মানুষ সমান। সুতরাং ধর্মে ধর্মে বিরোধের কোনও কারণ নেই।


রাজা রামমোহন রায়

সমাজ সংস্কারে রামমোহনের গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি প্রচার চালাতে থাকেন সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বহুবিবাহ, সমাজে নারীর অমর্যাদা প্রভৃতি কু-প্রথার বিরুদ্ধে। রামমোহনের দাবি মেনে নিয়ে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে "সতীপ্রথা" নিষিদ্ধ করেন (১৮২৯ খ্রিঃ)।

তিনি সম্ভবত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭ খ্রিঃ) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামমোহন ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ।

বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি হিন্দি ও ফারসি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্রের নাম ছিল 'সংবাদ কৌমুদী'। ইংরেজ শাসকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। রামমোহনের ধর্মচিন্তার অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই রামমোহন নতুন পথের সন্ধান দেন। দেশের বাইরে সব ধরনের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বারবার সমর্থন জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভারতপথিক' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' রূপে অভিহিত হয়েছেন।

ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রিঃ)

ভারত হিতৈষী বিদেশিদের মধ্যে যাঁরা ভারতবাসীর কল্যাণ ও উন্নতির জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের মধ্যে ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য

চিন্তা-ভাবনার প্রভাবে এদেশে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটেছিল, তা হল শিক্ষাব্যবস্থা। ভারতের শিক্ষিত মানুষদের মতো ডেভিড হেয়ারের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের দ্বারা এদেশের মানুষের মনের প্রসার ঘটানো। তিনি কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বর্তমানে স্কুলটি 'হেয়ার স্কুল' নামে পরিচিত। ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'হিন্দু কলেজে'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ওই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন ডেভিড হেয়ার। অল্প দামে ভাল স্কুল পাঠ্য বই রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রিঃ)।



ডেভিড হেয়ার

তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় পরের বছরে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল সোসাইটি'। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেও তাঁর অভিমত ছিল একমাত্র বাংলা ভাষাই শিক্ষা প্রসারের সহায়ক হতে পারে। তাঁর ব্যবসালব্ধ অর্থ তিনি স্কুলগুলির জন্য ও ছাত্র কল্যাণে ব্যয় করতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে থেকে গ্রামের বহু মানুষজনকে 'চুক্তিবদ্ধ কুলি' হিসাবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি উপনিবেশগুলির চালান দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে এরা ক্রীতদাসে পরিণত হত। ডেভিড হেয়ার এই সব দরিদ্র-অজ্ঞ গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট স্বচক্ষে দেখে এই প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামেন এবং তিনি সফলও হন। মহান হৃদয়, মানব-প্রেমিক, প্রচার বিমুখ ডেভিড হেয়ার ভারতে, বিশেষভাবে বাংলায়, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জগন্নাথশঙ্কর শেঠ (১৮০৩-১৮৯২ খ্রিঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাংলাদেশে শুরু হলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নবজাগরণ ঘটতে বিলম্ব হয়নি। পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্র ছিল সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ছিলেন বোম্বাই অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। তিনি জন্মেছিলেন (১৮০৩ খ্রিঃ) এক ধনী উচ্চবিত্ত পরিবারে। জগন্নাথশঙ্কর শেঠ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভারতের মতো দেশে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মতো জগন্নাথশঙ্কর শেঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্রণে এদেশের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে তিনি সর্বোত্তম বলে মনে করতেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য ভারতীয়দেরই উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য সরকারের মুখাপেক্ষী না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের তিনি ছিলেন প্রবল সমর্থক। নিজের বাসগৃহের প্রাঙ্গণে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজের কন্যাদের সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। জগন্নাথশঙ্কর শেঠ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাই প্রদেশের জনজীবনের এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসার দ্বারা দেশের মঙ্গলচিন্তা করে গেছেন।

ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১ খ্রিঃ)

ডিরোজিও ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই তরুণ শিক্ষকটির প্রতি

ছাত্রগণ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাত্র ছয় বছর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি যে ছাত্র ও শিষ্যদল গঠন করেন তাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'নব্যবঙ্গ' নামে খ্যাত। ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করে তবেই কোনও কিছুকে গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিতেন। স্বাধীন চিন্তার বিকাশের জন্য তিনি 'পার্থেনন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের ন্যায়, সততা, সত্যের অনুসন্ধান, দেশপ্রেম ও পরহিতৈষণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দেন। এর ফলে তাঁদের মনে জাতীয়তাবোধের ও নবচেতনার উন্মেষ ঘটে।



ডিরোজিও

ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যগণ এদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা 'এনকোয়েরার', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়।

রেভারেন্ড জেমস লঙ (১৮১৪-৮৭ খ্রিঃ)

যে সামান্য সংখ্যক ইউরোপীয় ভারতীয়দের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যাঁরা এদেশের ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ তাঁদের অন্যতম। এই আইরিশ ধর্মপ্রচারক ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন এবং একটি মিশনারি স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নেন। পরে তিনি নিজেও একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জেমস লঙ স্ত্রীশিক্ষা

ও সমাজ সেবামূলক সংস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। জেমস লঙের অনুরোধে কবি মাইকেল মধুসূদন নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই বইটি প্রকাশনার জন্য মানহানি করার অপরাধে লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবরা মামলা করলে বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকে লঙের হয়ে মামলা পরিচালনার জন্য খরচের যোগান দেন এবং পরে জরিমানার টাকাও দিয়ে দেন। শিক্ষা, সমাজ, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা প্রবাদের একটি সংকলনও প্রকাশ করেন। ভারতের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জেমস লঙের রচনা ও কাজের মধ্যে সব সময়ে দেখা যায়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮ খ্রিঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মুসলমান সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হলে এদেশের মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। এর ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, জীবিকা অর্জন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অনগ্রসর থেকে যান। মুসলমান সমাজের এক সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর প্রবর্তিত উদার সমাজ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। চিন্তার স্বাধীনতাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বারাই মুসলমান সমাজ প্রকৃত উন্নতি করতে পারবে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা



সৈয়দ আহমদ খান

প্রসারের জন্য স্কুল স্থাপন এবং পাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থ উর্দুতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫ খ্রিঃ) পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুলসমানদের জীবনে নতুন যুগের সূচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতীয় সভ্যতা ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একত্র করে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ভারতে তিনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পণ্ডিতের পরিবারে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম হয়।



বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ব্রত ছিল শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষার প্রসার এবং মেয়েদের সব দিক থেকে সামাজিক মুক্তি। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর পরিশ্রম কম ছিল না। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া মেয়েদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি বেথুন সাহেবকে সহযোগিতা করেন। বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অসামান্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিত। বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'। তিনি আরও বলেছেন যে, 'ঈশ্বরচন্দ্র বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছিলেন।' তাঁর গদ্য ভাষারীতি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার পথ দেখিয়েছে। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি, 'সীতার

বনবাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিশুরা যাতে সহজে বাংলা ভাষা শিখতে পারে সেজন্য 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি বই লেখেন। এগুলি তাঁর দূরদৃষ্টি ও শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহের পরিচয় দেয়। তথাপি, এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তার বিস্তারের কথা তিনি ভোলেননি।

উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কারের কথা বললে বিদ্যাসাগরের নাম প্রথম মনে পড়ে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হল হিন্দুসমাজে "বিধবা বিবাহ" প্রবর্তন। তিনি শাস্ত্র আর যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে বিধবা বিবাহ কোনোমতেই দোষের নয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ও তাঁর সমর্থন লাভ করেছিল। কথা আর কাজে এবং সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিজীবনের সঙ্গতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো বাংলার নবজাগরণের অন্য কোনও সংস্কারকের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। 'আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না।....বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে একক ছিলেন'— তাঁর সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেন রবীন্দ্রনাথ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রিঃ)


মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন দত্ত বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে সামান্য ছোট ছিলেন। কৈশোরে হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একজন সদস্য। মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে যান। প্রথমে তিনি ইংরেজি ভাষাতে সাহিত্য চর্চা করবেন বলে স্থির করেন কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এই সময়

থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চা করেন এবং এই ভাষাতে "মেঘনাদবধ" ও আরও কয়েকটি কাব্যনাটক ও অনেক কবিতা লেখেন। মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইটি এদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের এক মর্মস্পর্শী বাস্তব ছবি। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের পরিবেশ এনে দেন। এই স্বদেশপ্রেমিক, জনদরদী কবি তাঁর মৃত্যুর আগে যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি তাঁর সমাধিক্ষেত্রে একটি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে জননীর কোলে
শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম।"

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩ খ্রিঃ)

পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতে সংস্কার আন্দোলনে আর্য সমাজের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি জন্মেছিলেন (১৮২৪ খ্রিঃ) গুজরাটের এক গ্রামে। তিনি যে ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন শুরু করেন তা বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুধর্মে প্রচলিত মূর্তিপূজা, উপবাস প্রথা, শ্রাদ্ধাদির রীতিনীতি ও অস্পৃশ্যতার তিনি বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন অবিকৃত বৈদিক ধর্মেই তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম গ্রহণে প্রচলিত বাধার বিরোধিতা করে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে আঘাত করেছিলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহকে তিনি নিন্দা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেছেন। শিক্ষার প্রসার বিশেযত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন গুরুবাদের বিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর কোনও স্মৃতিমন্দির নির্মাণ না করার জন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতে চরমপন্থী মতবাদ গঠনের পথ প্রস্তুত করেন।

মহাত্মা জোতিবা ফুলে (১৮২৮-৯০ খ্রিঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বোম্বাইয়ে স্থাপিত 'পরমহংস মণ্ডলী' শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনকে যাঁরা আরও এগিয়ে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে মহাত্মা জোতিবা ফুলের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মহারাষ্ট্রে তাঁর অনুগামীরা তাঁর শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁকে মহাত্মা নামে অভিহিত করেন। দারিদ্র্য, নিজের 'নিচুজাতের' মানুষদের অজ্ঞতা এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরোধিতার জন্য স্কুলের গণ্ডির বাইরে লেখাপড়া শেখার সুযোগ তিনি পাননি। যে সামান্য শিক্ষালাভের সুযোগ তিনি পান তা থেকে এটাই তিনি বুঝেছিলেন যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন কত বেশি। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থসম্পদ, উচ্চশিক্ষা—এ সব কিছুই তাঁর ছিল না, কিন্তু ছিল তাঁর নিষ্ঠা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। আর এর দ্বারা তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রসারে অন্যতম পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেন। জোতিবা ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে। বোম্বাই প্রদেশে তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি পুনায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং 'হরিজন'দের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৫১ খ্রিঃ)। পরে 'হরিজন'দের জন্য আরও দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গণশিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্যও দাবি জানান। হিন্দু সমাজের 'নিচুজাতের' মানুষ বলে যারা পরিচিত ছিল তাদের উন্নতির জন্য আজীবন লড়াই করলেও সমাজের 'উঁচুজাতের' মানুষদের কখনও ঘৃণা করেননি। উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে জোতিবা ফুলের অবদান অপরিসীম। পরবর্তী সময়ে মহারাষ্ট্রে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁর মতবাদ সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করে।

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৩ খ্রিঃ)

উনিশ শতকে ভারতে সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে

অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী। তিনি জন্মেছিলেন (১৮৩৪ খ্রিঃ) পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) এক গ্রামে। এই নির্ভীক, উদার-হৃদয় নারী স্ত্রীজাতির সামগ্রিক কল্যাণের কাজে সারাজীবন নিজেকে নিয়োজিত করেন। সম্পূর্ণভাবে নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা, আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন। প্রবল বাধা, প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংস্কৃতও তিনি শিখেছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 'সখী সমিতি'-র সদস্যাও তিনি হন। বাংলা গদ্যে ও পদ্যে বেশ কয়েকটি বই তিনি লেখেন। এগুলির মধ্যে 'রূপ জালাল', 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত', 'সংগীতসার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল অন্তরের টান। নিজের খরচে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় এবং একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য তাদের হোস্টেলের খরচও তিনি বহন করতেন। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল। শুধু মেয়েদের চিকিৎসার জন্যই তিনি একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং সেটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল নারীর কথা তাঁর চিন্তায় স্থান পেয়েছিল। অন্যান্য জনহিতকর কাজেও তিনি অকাতরে দান করেছেন। জনসেবায় তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ইংরেজ শাসনকালে ভারতে একমাত্র মহিলা ফয়জুন্নেসাকে 'নবাব' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সমস্ত ভূসম্পত্তি মৃত্যুর আগে জাতির উদ্দেশ্যে দান করে যান।

রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) ও বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিঃ)

সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামের গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধ হন। সকল মানুষের বোঝার মতো ভাষাতে রামকৃষ্ণদেব এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি বলেন যে সবাই এক মায়ের সন্তান। 'যত মত তত পথ'—তাঁর এই

বাণী ধর্ম ও মানবজীবনকে এক নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে—সব ধর্মের আচরণ দ্বারাই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। রামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার উদার শিক্ষা দেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনিই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগৎ-প্রসিদ্ধ হন। আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর



রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিবেদিতা

করে ভারতবাসীকে জেগে ওঠার ডাক দেন তিনি। তিনি বলেছিলেন যে দেশের কল্যাণই যেন সকল ভারতবাসীর সাধনা ও স্বপ্ন হয়। তাঁর আহ্বান এদেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছিলেন—সকল শিক্ষা প্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ গড়ে তোলা। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা আইরিশ মেয়ে ভগিনী নিবেদিতা বাংলার বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল ভারতে জাতিভেদহীন বলিষ্ঠ স্বাধীন ও শোষণমুক্ত দেশ গঠন। তিনি ভারতের মানুষের কাছে আহ্বান জানান : 'হে ভারত ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল—আমি ভারতবাসী—ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই....'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিঃ)

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশিকতা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। তিনি বঙ্গদেশের প্রথম দুইজন গ্রাজুয়েটের একজন। এরপর তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত থাকলেও ইংরেজ শাসনব্যবস্থার দোষক্রটি তিনি বলিষ্ঠভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিঃ)। পরে এক এক করে তাঁর লেখা 'কপালকুণ্ডলা', 'দেবী চৌধুরানী', 'বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোক রহস্য' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে শৈশব থেকে যৌবনে উপনীত হয়। অহিংস ও বিপ্লবী—উভয় আন্দোলনই তাঁর গ্রন্থ ও সংগীত থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগাতে তাঁর 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রিঃ) উপন্যাসটির ভূমিকা অসাধারণ। আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' গানটি স্বাধীনতা আন্দোলনে মুক্তি মন্ত্রের কাজ করেছে। ওই গান ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন নিজে সুর দিয়ে। 'বন্দেমাতরম' গানটির জাতীয় সংগীত হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর উপন্যাস ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং পাশ্চাত্য ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট) (১৮৪০-১৮৮৩ খ্রিঃ)

সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির মতো দেশের সংস্কৃতির আরেকটি ধারা সংগীত। সংগীতচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে বিষ্ণুপুরের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। সংগীত জগতের কিংবদন্তি যদুভট্ট ছিলেন

বিষ্ণুপুরের সন্তান। লেখাপড়া অপেক্ষা সংগীত তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করত। সংগীত শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতার নিকট। পরে সংগীত শিক্ষার টানে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন মাত্র পনেরো বছর বয়সে। প্রথমে কলকাতায় পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা গুণীর নিকট থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন। এর ফলে তাঁর গানে এসেছিল বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য। ধ্রুপদ গানেই ছিল যদুভট্টের অসাধারণত্ব। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি অনেক দরবারে থেকেছেন, গান শুনিয়েছেন এবং সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সংগীত-শিষ্য হন। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' গানটিতে যদুভট্টই প্রথম সুর দেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছে কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে যদুভট্টের মতো সংগীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে এই অসাধারণ সংগীত সাধকের জীবনাবসান হয় (১৮৮৩ খ্রিঃ)।

মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রিঃ)

মহারাষ্ট্রের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। সুপণ্ডিত রানাডে ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য তিনি সারাজীবন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' স্থাপিত হলে (১৮৬৭ খ্রিঃ) রানাডে ওই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। ধর্ম সংস্কার অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের দিকেই রানাডে এবং তাঁর সহকর্মীরা দৃষ্টি দেন। স্ত্রীজাতির ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি, বিভিন্ন বর্ণের মানুষের একসঙ্গে বসে আহার গ্রহণ, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি ছিল আন্দোলনের কর্মসূচি। বঙ্গদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন আগেই শুরু হয়েছিল। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে রানাডে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পুনায় বিধবা বিবাহ সমিতি গঠন করেন। তাঁরই প্রেরণায় স্থাপিত হয় 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' (১৮৮৪ খ্রিঃ)। দাক্ষিণাত্যে সামাজিক ও শিক্ষা

সংস্কারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মারাঠি সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। রানাডে শুধু একজন সংস্কারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়ার শিল্পী।

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র (১৮৫৮-১৯৩৭ খ্রিঃ)

পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এ সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনি একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৮৭৬ খ্রিঃ)। এর ফলে উনিশ শতকের শেষে বেশ কিছু ভারতীয় মনীষী বিজ্ঞানসাধনাতে মনোনিবেশ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নিষ্ঠাবান এই অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের মনের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রবল উৎসাহ ঢুকিয়ে দেন। পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাতে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। বেতারে সংবাদ পাঠানোর পদ্ধতি তাঁর আবিষ্কার। অন্য দিকে, স্বাধীন গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন যে উদ্ভিদ বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এদেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামে এক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। জগদীশচন্দ্র একই সঙ্গে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তিনি বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞানচর্চার পথও দেখান। তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি তারই দৃষ্টান্ত। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ রচনা ছিল তাঁর অন্যতম সাধনা।


জগদীশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিঃ)

ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক,

প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রায় সব বিভাগেই তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। তারই ফল বাংলা সাহিত্যের এখনকার চরম উন্নতি। তাঁর রচনাসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ''গীতাঞ্জলি'' কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ কেবল শ্রেষ্ঠ কবিই নন, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসাবেও সমস্ত পৃথিবীতে সম্মানিত। আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত এবং চিত্রশিল্পেও তাঁর ছিল বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর ভারতীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্রটি বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকটা স্থান অধিকার করে ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলি দেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর রচিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত।

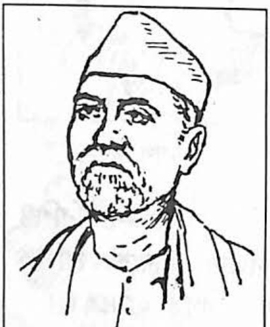
রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মাধ্যমে স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাসকে সংযত করে সকল সম্প্রদায়ের ও সভ্যতার মিলনে ভারতের মর্মবাণী শোনান।

দেশের বাইরেও যখনই কোথাও কোনও অনাচার অন্যায় দেখেছেন তখনই তাকে কবি ধিক্কার জানিয়েছেন। আফ্রিকাতে কালো মানুষের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জাপানের চিন আক্রমণ, বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে ইতালি ও জার্মানি প্রভৃতি দেশের একনায়ক শাসকদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে একই সুরে কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন, অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর মতে "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।"

সংগীত সাধক আলাউদ্দীন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২ খ্রিঃ)

সংগীত জগতের এক অসামান্য প্রতিভা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ। কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করেন। দীর্ঘকাল ধরে যে সংগীত রাজদরবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসেন। অত্যন্ত অল্প বয়সে প্রথমে তিনি তাঁর পিতার কাছে সেতার শেখেন। পরে বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে সংগীত শিক্ষার সুযোগ পান। সংগীত শিক্ষার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। সেতার, সরোদ থেকে শুরু করে এমন কোনও বাদ্যযন্ত্র ছিল না যা তিনি দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন না। বহুস্থান ঘুরে অবশেষে মধ্যপ্রদেশের মাইহারের রাজার দরবারে স্থায়ীভাবে স্থান পান। রাজা তাঁর শিষ্যত্ব নেন। এখানেই তিনি দরবারের সংগীতকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্ধ, অনাথ মানুষদের তিনি সংগীত শিক্ষা দিতে থাকেন। 'মনোহরা', 'চন্দ্রসারং' প্রভৃতি কয়েকটি নতুন বাদ্যযন্ত্র তিনি সৃষ্টি করেন। নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন ভারতবিখ্যাত 'মাইহার ব্যান্ড'। পণ্ডিচেরি আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সরোদের বাজনা শুনে তাঁকে সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের একজন বিশিষ্ট সাধক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে আছেন পুত্র আলি আকবর খাঁ, কন্যা অন্নপূর্ণা, জামাতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রমুখ। অনেক সম্মানে ভূষিত আলাউদ্দীন খাঁ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার এক উচ্চ আসনে বসিয়েছেন।



আলাউদ্দীন খাঁ

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রিঃ)

উনিশ শতকের নবজাগরণ ভারতে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ যে শিল্পরীতি সৃষ্টি করেন তাই ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণ ঘটায়। তিনি ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা শুরু হয় বাল্যবয়সে ঠাকুরবাড়িতেই। পরে ইউরোপীয় ও জাপানি শিল্পীদের নিকট থেকে তাঁদের দেশের শিল্পরীতি শেখেন। এরপর তিনি ভারতের প্রাচীন চিত্রাঙ্কনরীতি নতুন করে উদ্ধার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতা হিসাবে তিনি স্বীকৃত হলেন। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় অঙ্কনরীতি উদ্ধার করার জন্য ভারত জুড়ে এক আন্দোলন



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গড়ে তোলেন। তাঁর 'কৃষ্ণলীলা' বিষয়ক চিত্রাবলী, 'ওমর খৈয়াম' এবং 'আরব্য রজনী চিত্রাবলী, 'বাসবদত্তা', 'কচ ও দেবযানী' প্রভৃতি চিত্রগুলি তাঁর শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। লেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান। ছোট ও বড়োদের জন্য তিনি অনেকগুলি বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন। তাঁর লেখা 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূত পতরীর দেশ', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি বইগুলি সব বয়সের মানুষ সমানভাবে উপভোগ করে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, আব্দুর রহমান চুঘতাই প্রমুখ শিল্পী হিসাবে সারা বিশ্বে বন্দিত। নিঃসন্দেহে অবনীন্দ্রনাথই আমাদের প্রথম আধুনিক ভারতীয় জাতীয় শিল্পী।

জাতীয়তাবাদ : সাহিত্য ও মুক্তি আন্দোলন

নবজাগরণ ও জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন মনীষীর পরিচয় সংক্ষেপে জানা গেল। এঁরা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলে মনীষিবৃন্দ নানাভাবে দেশের সেবা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের মতো ভারতের অন্য সব অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও জাগ্রত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। অসমীয়া সাহিত্যিক আনন্দরাম ফুকন, লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ; ওড়িয়া সাহিত্যে ফকিরমোহন সেনাপতি, মধুসূদন রাও ; মারাঠি সাহিত্যে হরিনারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলংকার, গোপালহরি দেশমুখ ; গুজরাটি সাহিত্যিক নর্মদাশঙ্কর লাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের তামিল সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী সুব্রহ্মণ্যভারতী ; তেলুগু সাহিত্যে বীরেশ লিঙ্গম পান্তালু ; মালয়ালাম সাহিত্যে শ্রীনারায়ণ গুরু প্রমুখের বিশেষ অবদান ছিল। একইভাবে হিন্দি ভাষায় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, প্রেমচন্দ ; উর্দু ভাষাতে আলতাফ হুসেন, শিবলি নোমানি, মহম্মদ ইকবাল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণীয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসকেরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের সূচনা করে, শুরু হয় আমাদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ইতিহাস। কিন্তু ভারতের মানুষ মাথা নিচু করে মেনে নেয়নি এই প্রভুত্বকে। ইংরেজ-বিরোধী প্রতিরোধের মশাল এদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়াতেই জ্বালিয়েছিলেন কিছু মানুষ। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতির ধারণা বিকশিত হয়। তাদের চেতনায় দেখা দেয় সমালোচনা ও প্রতিবাদের অঙ্কুর। পরবর্তীকালে এই অঙ্কুরই রূপ নিল স্বাধীনতার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে। এই মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেন এদেশের সমস্ত অঞ্চলের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ। তাঁদের মধ্যে উড়িষ্যার 'উৎকল মণি' গোপবন্ধু দাস (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে 'উৎকল মণি' আখ্যা দেন) ; বোম্বাই-এর দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পরমহংস মণ্ডলী', বেরহামজি মালাবারি, পণ্ডিতা রমাবাঈ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ; মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা, চিদাম্বরম পিল্লাই ; পাঞ্জাবের ভাই বীর সিং ; বাংলার রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ অগ্রণী মানুষদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১। উত্তর লেখো :

রামমোহন ভারতে কী ধরনের শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন ?

ডেভিড হেয়ার ভারতবাসীর নিকট কী কারণে স্মরণীয় ?

স্যার সৈয়দ আহমদ কীভাবে ভারতের মুসলমান সমাজে জাগরণ ঘটান ?

ডিরোজিও কে ছিলেন ?

ডিরোজিওর শিষ্যদের কী নামে অভিহিত করা হয় ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ব্রত কী ছিল ?

মধুসূদন দত্তের লেখা একটি কাব্যের নাম লেখো।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কার আন্দোলনের মূলকথাটি কী ?

নতুন ভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

জগদীশচন্দ্র বসু ছাত্রদের কীসে উৎসাহ দিতেন ? বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর কী অবদান ছিল ?

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তার নাম কী ? কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় ?

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ভারতে কী প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন ?

জোতিবা ফুলের নাম আমাদের দেশে স্মরণীয় কেন ?

শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অবদান কী ছিল ?

জেমস লঙ কে ছিলেন ? ভারতবাসীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

এদেশে নারীজাতির কল্যাণের জন্য নবাব ফয়জুন্নেসার অবদান কী ছিল ? তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেওয়া হয় কেন ?

ভারতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ প্রসারে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান কী ছিল ?

যদুভট্ট কে ? তিনি কীভাবে সংগীত শিক্ষা করেন ?

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভার কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

ভারতে আধুনিক শিল্পের জনক কে ? তাঁকে প্রথম আধুনিক ভারতীয় জাতীয় শিল্পী বলা হয় কেন ?

২। **এক কথায় উত্তর দাও :**

রামমোহন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

সতীদাহ প্রথা কে নিষিদ্ধ করেন ?

'ভারতপথিক' নামে পরিচিত কে ?

বিধবা বিবাহ আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাশ হয় ?

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম কী ছিল ?

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা কে ছিলেন ?

কোন ভারতীয় বেতারে সংবাদ পাঠাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ?

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

'স্কুল বুক সোসাইটি' কে স্থাপন করেন ?

আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

'নীলদর্পণ' নাটকটি কার লেখা ?

ভারতে একমাত্র কোন মহিলাকে ইংরেজরা নবাব উপাধি দেয় ?

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি কে লেখেন ?

বাংলা ভাষায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসটির নাম কী ?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতের সাধারণ মানুষ ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে। তেমনি আবার অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যও সমানে লড়াই চালিয়ে গেছে।

কৃষক বিদ্রোহ: ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ গভর্নর ক্লাইভ, দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য সুবে বাংলার দেওয়ানির অধিকার আদায় করলেন। এর সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার উপর আসল ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সমগ্র উত্তর বাংলা জুড়ে সন্ন্যাসী-ফকিরগণ বিদ্রোহ শুরু করেন। এঁরা ছিলেন গরিব হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দল এবং এঁদের সংখ্যা ছিল অর্ধ লক্ষের মতো। ইংরেজ শাসন ওই অঞ্চলে অচল হয়ে গিয়েছিল।

চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত চাষীদের এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ধলভূম-সিংভূম অঞ্চল জুড়ে। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যভারতে, মহারাষ্ট্রে, কর্নাটকে, উড়িষ্যায় অনেকবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে। উনিশ শতকে ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে ইংরেজবিরোধী কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার ফেরাজি আন্দোলনও ছিল একই প্রকৃতির। বাংলার নীল-চাষীরা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলনে নামে (নীলবিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬০ খ্রিঃ)। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকে নীলচাষীদের সমর্থন জানান। মহারাষ্ট্রের কৃষকরা মহাজনদের শোষণের ফলে সর্বস্বান্ত হতে থাকে। ইংরেজ শাসকদের সমর্থন ছিল মহাজনদের প্রতি। শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গ্রাম থেকে মহাজনদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সরকার ওইসব বিদ্রোহ কঠোরভাবে

দমন করে। পরবর্তীকালে ভারতের কৃষক আন্দোলন ওই আন্দোলনগুলি থেকে প্রেরণা পায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩১ খ্রিঃ), সিদো-কানহুর নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ) এবং বীরশা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহ ইংরেজদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) : ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৮৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত একশো বছর ধরে ইংরেজরা ভারতে নির্মমভাবে শোষণ ও অত্যাচার চালায়। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের মনে অসন্তোষের আগুন ধীরে ধীরে জমে ওঠে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেই জমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিদ্রোহ শুরু করে ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সিপাহীরা (১৮৫৭ খ্রিঃ)। গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেরা সিপাহী হিসাবে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। এই সব সিপাহীরা



ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে একসঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য। কয়েকজন দেশীয় রাজা, জমিদার এদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। লড়াই করে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছেন হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাহী, সাধারণ মানুষ। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। বিদ্রোহী নেতা তাঁতিয়া তোপি ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য দিল্লির শেষ মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু আর এক বিদ্রোহী নেতা

নানাসাহেবকে ইংরেজরা ধরতে পারেনি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিদ্রোহীরা সফল না হলেও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব হচ্ছে বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহের প্রসার এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যোগদান। এই বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ আইনসভা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটায় (২ আগস্ট, ১৮৫৮ খ্রিঃ)। মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ভারতের শিক্ষিত মানুষের জাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। এ দেশে রাজনৈতিক দল গঠন শুরু হয়েছে ওই শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে। কলকাতায় 'ভারতসভা' গঠিত হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটে বোম্বাইতে। প্রথম থেকেই ভারতের জাতীয় নেতারা বলেছিলেন যে, তাঁদের দাবি হিন্দু, মুসলমান বা শিখের দাবি নয়। বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি বা তামিলের দাবি নয়। তাঁদের দাবি ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর। প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে কংগ্রেস কোন আন্দোলনে না নেমে সরকারের কাছে বিভিন্ন সংস্কারের আবেদন জানায়। তখন অধিকাংশ নেতা বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি কোনও অন্যায় করবে না।

কিন্তু আরেক দল নেতা কংগ্রেসের ওই নীতির পরিবর্তন চাইলেন। মহারাষ্ট্রের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক দেশবাসীর সামনে নতুন এক আদর্শ তুলে ধরলেন। "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, আমরা তা অর্জন করবই"—তিলকের এই ডাকে সাড়া দিলেন বাংলার জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল, পাঞ্জাবের শ্রদ্ধেয় লালা লাজপৎ রাই। দেশের মানুষ তাঁদের সমাদর জানিয়ে "লাল-বাল-পাল' বলত।



লালা লাজপত রাই বালগঙ্গাধর তিলক বিপিনচন্দ্র পাল

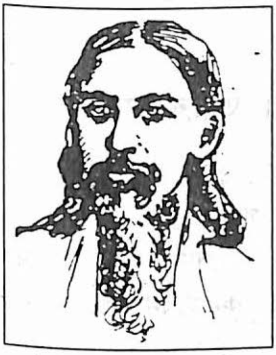
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে দেখে ইংরেজ শাসকরা ভয় পেয়েছিল। তারা পালটা আঘাত করল। বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দুভাগ করে দিলেন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ)। রাজনৈতিক কারণেই এটা করেছিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। সারা বাংলা, এমনকী সারা ভারত গর্জন করে জানাল যে—আমরা বঙ্গভঙ্গ মানছি না। অন্যান্য জাতীয় নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রাখিপূর্ণিমার দিন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন। রাস্তায় মিছিল করে মানুষজন রবীন্দ্রনাথের গান গাইল—"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গড়ে উঠল 'বয়কট' ও 'স্বদেশী আন্দোলন'। এ দেশের মানুষ বিলাতি কাপড় এবং অন্যান্য বিলাতি জিনিস বর্জন করল। ধনী-গরিব-মধ্যবিত্ত—সব শ্রেণীর মানুষ স্বদেশি কাপড় পরল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—এই গান মুখে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অনেকে স্কুল-কলেজ ছেড়ে স্বদেশি কাপড় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করতে লাগল। এই স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশের সর্বত্র এবং ভারতের অনেক স্থানে

ছড়িয়ে পড়ে। শুধু বিদেশি জিনিস বর্জন করাই হয়নি—একে একে বর্জন করা হয় ইংরেজদের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত প্রভৃতি। ইংরেজদের এবং তাদের প্রতি অনুগত ভারতীয়দের সামাজিকভাবে বর্জন করা হয়। বিদেশি জিনিসপত্র বর্জনের সঙ্গে স্থাপন করা হয় প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরির দেশি কলকারখানা। শিক্ষার প্রসারের জন্য গড়া হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

ইংরেজ শাসকরা হিংস্র দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন স্তব্ধ করার ব্যবস্থা নিলেন। জেল, লাঠি, বেত্রাঘাতের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হল। কলকাতার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ১৫ বছরের ছেলে সুশীল সেনকে বেত মারার হুকুম দেন। প্রত্যেক ঘা বেত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল চীৎকার করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দেয়। হাজার হাজার ছেলে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেছিল। বিপ্লবীরা গুপ্ত সমিতি গঠন করে। তাদের প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে বাংলার বিপ্লবী সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওই সমিতিগুলির প্রধান ছিল প্রমথনাথ মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি' এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিচালিত 'যুগান্তর গোষ্ঠী'। কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলী হয়ে যান। সেখানে গিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন দুই বিপ্লবী তরুণ—প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু। হত্যার চেষ্টা বিফল হলে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন। ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন ক্ষুদিরাম। আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।



অরবিন্দ ঘোষ

রাউলাট সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছু সময় ধরে জার্মানি ও তার মিত্র রাজ্যগুলির আক্রমণে ইংরেজরা নাজেহাল হয়ে পড়ে। শেষে অবশ্য

জার্মানরা পরাজিত হয়। যুদ্ধশেষে ইংরেজরা আবার প্রচণ্ড দমননীতি শুরু করে ভারতে। কুখ্যাত "রাউলাট আইন" চালু করে ভারতীয়দের সব নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে ওই আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। সভাটি হয় অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে একটি ঘেরা মাঠে। ইংরেজ সেনাপতি ডায়ার সমবেত জনতাকে কোনও রকম সতর্ক না করে সৈনিকদের মেশিনগান থেকে গুলি চালাতে আদেশ দেন। তার ফলে এক হাজারেরও বেশি নরনারী আর শিশু নিহত হয়। সারা ভারত শোকে, ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে ইংরেজদের দেওয়া 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন।

গান্ধিজি ও জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন গুজরাটের পোরবন্দর নামে একটি স্থানে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকাতে। সেখানকার কালো মানুষদের উপর শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ জানান। ভারতে ফিরে এসে বিহারের চম্পারণে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যাগ্রহ সফল হয়। গুজরাটের খেদা জেলাতে চাষীদের আন্দোলন এবং আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট তাঁর নেতৃত্বে সফল হয়।



গান্ধিজি

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন : জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর শুরু হয় অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রিঃ) তুরস্ক পরাজিত হয়। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাদের প্রধান ধর্মগুরু তুরস্কের সুলতানের প্রতি ইংরেজদের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪ খ্রিঃ) শুরু করেন। গান্ধিজি, মৌলানা মহম্মদ ও শওকৎ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন আন্দোলনের নেতা। এঁদের সঙ্গী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন মহাত্মা গান্ধি। খিলাফৎ প্রশ্নের সম্মানজনক মীমাংসা, পাঞ্জাবের নির্দোষ মানুষদের উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবিধান এবং স্বরাজের অধিকার অর্জন—এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন হয়।

আন্দোলন সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু এই সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৪ খ্রিঃ)

জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯ খ্রিঃ) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরের বছরে গান্ধিজির নেতৃত্বে লবণ-সত্যাগ্রহ শুরু হয়। গুজরাটের সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী নামক স্থানে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে গান্ধিজি প্রথম আইন ভাঙলেন। ধরসানা লবণগোলা দখল অভিযানে নেতৃত্ব দেন সরোজিনী নাইডু। সারা ভারত জুড়ে গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজার হাজার দুর্ধর্ষ পাঠান সীমান্ত গান্ধি খান আব্দুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করল। শোলাপুরে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করল। সরকার কঠোরভাবে এই আন্দোলন দমন করে।


খান আব্দুল গফ্‌ফর খান

মহাত্মা গান্ধিজি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেস ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে

আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। সম্পূর্ণ সফল না হলেওহলেও পরবর্তী জাতীয় আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে যোগ দিয়ে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট এলাকা দখল করে নেয়। ইংরেজদের ভারত-সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসেন। তাতে কোনও ফল না হওয়াতে গান্ধিজি ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন—'ভারত ছাড়ো'। তিনি দেশবাসীকে মন্ত্র দিলেন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (করব অথবা মরব)। সারা দেশ জুড়ে গণবিদ্রোহ শুরু হল ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগস্ট থেকে। মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। মিছিলের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তমলুকে মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে। কিন্তু তাদের সে জয় ছিল সাময়িক। আন্দোলন দমন করা হলেও ইংরেজ সরকার বুঝেছিল যে আর বেশিদিন ভারতকে তাদের শাসনাধীনে রাখা যাবে না।



মাতঙ্গিনী হাজরা

হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা গান্ধিজিকে ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল। তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ হরিজনদের সমান অধিকার দেবার চেষ্টাতে কেটেছিল। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি, বিহার, কলকাতা ও দিল্লিতে তাঁর নির্ভীক প্রচার দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাতে অনেকখানি সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি

দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচারের এক প্রার্থনা সভাতে গান্ধিজি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে নিহত হন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী

এক অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমিক হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি একদিকে ছিলেন কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, অন্যদিকে বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের একজন যোদ্ধা ও বরেণ্য সেনাপতি। সব রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বড় সরকারি চাকুরির প্রলোভন ত্যাগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও প্রথমে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ নেন। দেশের মুক্তির জন্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য পরপর দুবার তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার গৌরব অর্জন করেন।



নেতাজি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সৈনিকদের একটা অংশ জাপানিদের হাতে বন্দী হন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সেই ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে জ্ঞানী প্রীতম সিং, ক্যাপ্টেন মোহন সিং প্রমুখের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। রাসবিহারী সেই সময়ে জার্মানি থেকে সুভাষচন্দ্রকে এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় নিজের বাড়িতে নজরবন্দী থাকার সময়ে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে শেষে জার্মানিতে আসেন। সেখানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের নিয়ে একটা সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সময়ে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে 'নেতাজি' বলে সম্বোধন করেন এবং 'জয়হিন্দ' বলে অভিবাদন জানান। নেতাজি জাপানে আসেন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেন (১৯৪৩ খ্রিঃ)। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার। দুইদিন পরে এই



লক্ষ্মী স্বামীনাথন

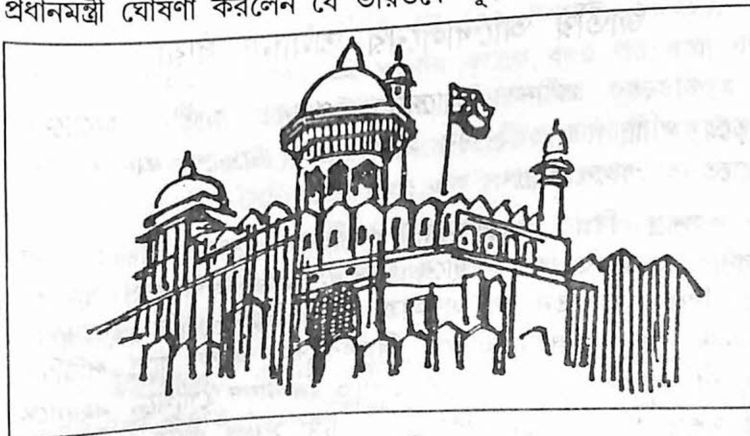
সরকার ইংরেজ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর রণধ্বনি হল 'দিল্লি চলো'। সুভাষচন্দ্র সৈন্যদের উজ্জীবিত করার জন্য বললেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। গঠন করা হয় তিনটি পদাতিক বাহিনী। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠিত হয় "ঝাঁসির রানি বাহিনী" নামে নারীদের একটা বাহিনী। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'বাল সেনাদল'ও গঠন করা হয়। দেশকে স্বাধীন করার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু সেই বাহিনী নিয়ে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে এসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ভারতের মাটিতে কোহিমাতে আজাদ হিন্দ বাহিনী স্বাধীনতার পতাকা উড়ায়। আজাদ হিন্দ বাহিনী ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ভারতের একটা বিরাট এলাকা তাদের দখলে আসে। অবশ্য বেশিদিন সেই অবস্থা বজায় থাকেনি। শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রচেষ্টা সেই সময় সফল হয়নি। চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোতে না পারলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক বিশেষ অবদান আছে। বহু সম্প্রদায়, শ্রেণী, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শে নেতাজি যে ঐক্য গড়ে তোলেন তা ছিল অসাধারণ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ ইংরেজদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আর ভারতীয়দের মধ্যে এনে দেয় এক উন্মাদনা ও প্রেরণা। যুদ্ধ শেষে দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচার আরম্ভ হলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তার ফলে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে তাঁদের মুক্তি দেয়। আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশ শক্তিকে বড়ো রকমের নাড়া দিয়েছিল। ভারতীয় সৈনিকদের উপর আর যে নির্ভর করা যাবে না এটা ইংরেজ সরকার স্পষ্টভাবে বুঝেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অবদান অবিস্মরণীয়।

নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬ খ্রিঃ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারত জুড়ে আবার স্বাধীনতার জন্য মিলিত গণসংগ্রাম শুরু হল। এই লড়াইয়ে অংশ নেয় হিন্দু-মুসলমান-শিখ—সব সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রথমে বোম্বাইতে পরে করাচি, কলকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহী হয়। ভারতীয় সৈনিকরা জব্বলপুরে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। বৈমানিকরা ধর্মঘট করেন। তাঁদের সমর্থনে ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, ছাত্র ও শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করলেন। বিদ্রোহী নাবিকরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। অসাফল্য সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নৌ-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটা স্মরণীয় ঘটনা। এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে তাদের রাজত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্ব

নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার ভীত হলেন। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব



জাতীয় পতাকা সমন্বিত লালকেল্লা

নিয়ে ইংল্যান্ডের মন্ত্রীরা দূত হিসাবে ভারতে আসছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঠিক এই সময়ে এ দেশের এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষের চক্রান্তে এবং ইংরেজদের উসকানিতে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। এই পরিস্থিতিতে বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন (জুন, ১৯৪৭) যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান—এই দুই ভাগে দেশ বিভক্ত হবে।

এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। দিল্লির লালকেল্লার মাথায় তিনরঙা জাতীয় পতাকা উড়ল। সেদিন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মিলনের উৎসবে মেতে উঠেছিল সমস্ত ভারতবাসী।

ইংরেজদের পরোক্ষ প্ররোচনায় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির উন্মত্ততার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে। ভ্রাতৃবিরোধ বন্ধ করার জন্য জীবনপণ করে গান্ধিজি সারা দেশে ঘুরতে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রার্থনাসভার আয়োজন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি এক সাম্প্রদায়িকতাবাদীর গুলিতে গান্ধিজি নিহত হন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে তিনি এ দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে থাকবেন।

জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য ধারা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধানত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে আরও অন্য ধারাতে আন্দোলন চলে।

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন : পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা এ দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব। ভারতে বিপ্লববাদের জনক বলে পরিচিত বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে গোপনে মহারাষ্ট্রে এক সশস্ত্র বাহিনী গড়েন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। লোকমান্য

তিলকের নিকট থেকে বিপ্লবীরা প্রেরণা পায়। মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠে কয়েকটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আর্য বান্ধব সমাজ' ও 'অভিনব ভারত'। আর্য বান্ধব সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন খানখোজি, ব্রজচাঁদ পোদ্দার প্রমুখ। আর 'অভিনব ভারত' প্রতিষ্ঠা করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার। বালকৃষ্ণ এবং দামোদর চাপেকার নামে দুই ভাই, বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রমুখ মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল।



ক্ষুদিরাম বসু

বাংলা ছিল ভারতের বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে বিপ্লবীরা গড়ে তোলেন গুপ্ত সমিতি। সতীশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ মিত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি' এবং বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত 'যুগান্তর-গোষ্ঠী' ছিল এই সমিতিগুলির মধ্যে প্রধান। এখানকার বিপ্লবীদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই তরুণ বিপ্লবী অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় (১১ আগস্ট, ১৯০৮), আর প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার কয়েক বছর পর বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) উড়িষ্যায় বুড়িবালামের যুদ্ধে নিহত হন (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)। একই সময়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে এক সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেন।

লালা হরদয়াল পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। লালা লাজপৎ রাই এবং আর্যসমাজের নেতারা গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন।

ইউরোপে, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো প্রভৃতি শহরে প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী

ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত 'গদর দল' সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ শাসন ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। জার্মানিতে ভারতীয়গণ 'বার্লিন কমিটি' স্থাপন করে ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ খ্রিঃ) পরে ভারতের বিপ্লবীরা একটি সংঘবদ্ধ সংগঠন গঠন করেন। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চে উঠে উদাত্ত কণ্ঠে বলেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক)।



সূর্য সেন গণেশ ঘোষ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। সেখানে তাঁরা একটি বিপ্লবী সরকারও গঠন করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে পাহাড়তলির ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণকালে শহিদ হন। মাস্টারদার ফাঁসি হয় (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪)। বিপ্লবীদের এক দুঃসাহসিক কাজের পরিচয় পাই—কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের মধ্য দিয়ে। তিনজন তরুণ—বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত এতে অংশ নেন।

বিপ্লবীদের আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শ্রমিক আন্দোলন : ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল ইংরেজ শিল্পপতিরা। শ্রমিকদের কোনও সংগঠন ছিল না। শ্রমিকদের উপরে মালিকের অত্যাচার ও শোষণ চলত অবাধে। শ্রমিকরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন ধর্মঘট করলেও তাতে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এক নতুন আশার আলো এনে দেয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ আই টি ইউ সি) গঠন করা হয়। সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপৎ রাই এর প্রথম সভাপতি হন। এই সময় থেকে শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গি মনোভাবও দেখা যায়। বামপন্থী সাম্যবাদী দল গঠিত হয় (১৯২৫ খ্রিঃ)। পরে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আরও কয়েকটি দল এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করে এসে দাবি জানায় যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব যেন গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে সরকার অনেক শ্রমিক ও বামপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়। এইসব আঘাত সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন থেমে যায়নি। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থিত হয়। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন প্রেরণা লাভ করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচারের প্রতিবাদে, কলকাতায় রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে এবং নৌ-বিদ্রোহের পক্ষে শ্রমিকরা সফল ধর্মঘট করে। জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান সামান্য ছিল না।

কৃষক আন্দোলন : ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াতেই কৃষকরা শোচনীয় অবস্থায় পড়ে। কৃষকরা বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করে প্রতিকারের জন্য। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্ব কৃষকদের ওই

আন্দোলনের মধ্যে আনা হয়নি। গান্ধিজি সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) কিষান সভা গঠিত হলে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়। জওহরলাল নেহরু ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। রুশ বিপ্লবের ফলে ভারতের কৃষক আন্দোলনে বামপন্থী ভাবধারা প্রবেশ করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলনে নামে। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের নেতারা লক্ষ্ণৌতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সারাভারত কিষান কংগ্রেস গঠন করেন (১৯৩৬ খ্রিঃ)। স্বামী সহজানন্দ ওই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পরের বৎসরে কিষান কংগ্রেসের নাম পরিবর্তন করে সারা ভারত কিষান সভা নাম দেওয়া হয়। কৃষক আন্দোলন বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের গণ-আন্দোলনগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬ খ্রিঃ) এবং অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন (১৯৪৫ খ্রিঃ) গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল।

ছাত্র আন্দোলন : পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো ভারতের ছাত্রসমাজ জাতীয় আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিঃ) বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন শুরু হলে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিশেষ তৎপরতা দেখায়। তাদের কার্যকলাপে সরকার ভীত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু তাতে ছাত্রসমাজ বিচলিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রতিটি গণ-আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছাত্রসমাজ দেশের মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সম্মেলনে মিলিত হয়ে ছাত্ররা তাদের কর্তব্য স্থির করেছে। এমনইভাবে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন থেকে গঠিত হয় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন। ছাত্র আন্দোলনে এই সংগঠন নেতৃত্ব দেয়।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিদের রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার শুরু হয়। ওই বিচারকে কেন্দ্র করে গণ-আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়। ছাত্রসমাজও আন্দোলনে বিপুলভাবে অংশ নেয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর আব্দুল রশিদের সশ্রম কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সমর্থনে শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘটের ডাক দেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রসমাজের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান

ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতের নতুন সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি এই সংবিধান চালু হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে যে, আমাদের দেশ সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই রাষ্ট্রে সব ধর্মের, সব জাতিগোষ্ঠীর, সব ভাষাভাষী মানুষের সমান অধিকার থাকবে। সংবিধানে লেখা মৌলিক অধিকারগুলি যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বাস্তব হয়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সকলের বিশেষ কর্তব্য। আর সেইসঙ্গে জনগণকে দেশের প্রতি মৌলিক কর্তব্যগুলিও পালন করতে হবে।



বি আর আম্বেদকর

অনুশীলনী

১। **এঁরা কী জন্য বিখ্যাত লেখো :**

নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সিদো-কানহু, বীরশা মুণ্ডা, চিত্তরঞ্জন দাশ, লাল-বাল-পাল, অরবিন্দ ঘোষ, আব্দুল গফ্‌ফর খান, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, লক্ষ্মীবাঈ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, গান্ধিজি।

২। **নীচের কথাগুলি কে কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা লেখো :**

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, আমরা তা অর্জন করবই।

৩। **নীচের ঘটনাগুলি কবে ঘটেছিল, কী জন্যই বা সেগুলি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার উল্লেখ করে কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, লবণ-সত্যাগ্রহ, আগস্ট আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (১৯২৯ খ্রিঃ)।

৪। **কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

'লাল-বাল-পাল' নামে পরিচিত ছিলেন কারা ? তাঁরা কী দাবি করেন ? ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গের প্রধান দাবি কী ছিল ? বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতে কী ধরনের প্রতিবাদ দেখা দেয় ?

অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের মূল তাৎপর্য কী ?

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈনিকরা কী প্রকার ভূমিকা নিয়েছিল ?

সংবিধানে ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলা হয়েছে ?

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় কেন ?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররা কী ভূমিকা নেয় ?

আমাদের দেশ সংবিধানে ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে ?

৫। **এক কথায় উত্তর দাও :**

শেষ মোগল সম্রাট কে ছিলেন ?

উত্তর বাংলা জুড়ে কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ?

আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয় কোথায় ? আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের কোথায় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেয় ?

ভারতের সংবিধান কার নেতৃত্বে রচিত হয় ? ভারতের শেষ ইংরেজ বড়লাট ছিলেন কে ?

ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের কী নাম ?

সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে কে সভাপতিত্ব করেন ?

আগামী দিনের পৃথিবী

আমরা জানি যে, মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে বাস করত, যখন সে সমাজ গড়ে তোলেনি, তখন মানুষের প্রধান কাজ ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। আর সেই সঙ্গে বনের পশুপাখি, সাপ, পোকামাকড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির হাত থেকে আত্মরক্ষা করা। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সে দু-পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে শিখেছে, হাতিয়ার ব্যবহার করে শিকার করতে ও বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখেছে। সে আগুন জ্বালাতে ও পোশাক পরতে শিখেছে। ধীরে ধীরে সে সভ্য হয়েছে। ধাতুর ব্যবহার শিখেছে, ঘরবাড়ি বানিয়েছে, খাদ্য উৎপাদনের কৌশল তার কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। সে সমাজ গঠন করে একসঙ্গে বাস করতে শিখেছে। সভ্যতার যত উন্নতি হয়েছে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন তত বেড়েছে ও উন্নতিও হয়েছে। ক্রমে মানুষ সমস্ত পৃথিবীর উপর নিজের পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। এখন এমন হয়েছে যে, বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বরং আজ বন্য জীবজন্তুকে বাঁচিয়ে রাখারই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষের অত্যাচার, নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের জন্য তারা আজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মুখে।

মানুষ কিন্তু হাতিয়ার বানানো এবং হাতিয়ারকে আরও উন্নত করার কাজ বন্ধ করেনি। যে মানুষের হাতিয়ার প্রথমে ছিল প্রস্তর খণ্ড, পশুর হাড়, গাছের ডাল, সেই মানুষের হাতিয়ার আজ পরমাণু বোমা। ওই বোমাতে দু-একজন মানুষ নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ এক মুহূর্তে মারা পড়ে। আজ পৃথিবীতে মানুষের হাতে এত অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে যে সেগুলি দিয়ে আমাদের এই গ্রহ পৃথিবীকে ধুলোর মতো গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ করা হলে শহর দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে যে পরমাণু বোমার মতো অস্ত্র মানুষের ধ্বংস, সভ্যতার অবলুপ্তি ডেকে আনবে। যুদ্ধের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে, পরমাণু অস্ত্র রদ করার জন্য দেশে দেশে মানুষ সোচ্চার হয়েছেন। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে মানুষ মিছিল বের করে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, "যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।"

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ একসঙ্গে আলোচনায় বসে কীভাবে যুদ্ধের বিপদ, পরমাণু বোমার পরিমাণ কমানো যায় তার চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষরা চাইছেন যে চিরকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ হোক।

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এখনও অনাহার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অভাব দূর হয়নি। এক একটি পরমাণু বোমা বানাতে বহু কোটি টাকা খরচ হয়। তার বদলে স্কুল, হাসপাতাল, বাড়ি, পথঘাট, রেলপথ বানানো সম্ভব হবে, চাষের উন্নতি করা যাবে, সেচব্যবস্থার উন্নতি করা যাবে। মানুষ অনাহারে থাকবে না, পোশাকের অভাবে কষ্ট পাবে না, ঘরের অভাবে রাস্তায়, গাছতলায় বাস করবে না। শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য, দুধ, খেলার মাঠ, খেলার উপকরণের অভাব হবে না। তাদের মন থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর হবে। যুদ্ধের ভয়, প্রাণহানি আর কষ্টের আতঙ্ক থেকে তারা মুক্ত থাকবে।

ভয়াবহ যুদ্ধের দুঃস্বপ্নমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ (লীগ অফ নেশনস)। একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই গঠিত হয় ইউ এন ও বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশই এর সদস্য। এই সংগঠন বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর।

আমরা শিশুরা পৃথিবীর আগামী দিনের নাগরিকরা আশা করব এবং দাবি জানাব—যুদ্ধহীন সুখী শান্তির পৃথিবী, আনন্দ আর আলোয় ভরা পৃথিবীর।

অনুশীলনী

১। উত্তর দাও :

সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠার আগে মানুষের প্রধান কাজ কী কী ছিল ?

বন্য জন্তুদের জন্য এখন কী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ?

পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবাই মুখর হয়ে উঠেছেন কেন ?

পরমাণু বোমা বানানো বন্ধ হলে সেই অর্থ দিয়ে কী কী মঙ্গলজনক কাজ করা যেতে পারে ?

আগামী দিনের নাগরিকরা কী আশা করে ?

বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি চেষ্টা হয়েছে ?

২। কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। এখন বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সে যুদ্ধ কেমন হবে এবং তার ফল কী হবে—এ প্রসঙ্গে তোমার ধারণা লেখো।

২। তুমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছ। তোমার কাছে আগামী দিনে পৃথিবীর রূপটি কেমন হবে সে সম্পর্কে কল্পনা করে লেখো।

শতাব্দী / শতকের হিসেব *

১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১০০ খ্রিস্টাব্দ—প্রথম শতাব্দী।
১০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০০ খ্রিস্টাব্দ—দ্বিতীয় শতাব্দী।
২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ—তৃতীয় শতাব্দী।

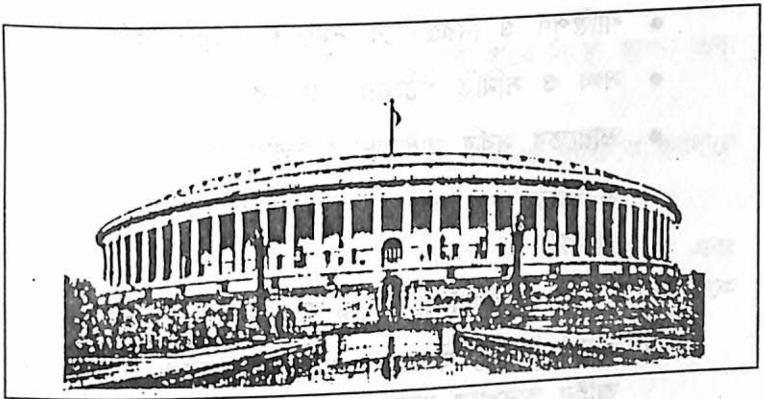
এমনিভাবে,

খ্রিস্টাব্দ	শতাব্দী / শতক
১০০১ — ১১০০	একাদশ
১১০১ — ১২০০	দ্বাদশ
১৭০১ — ১৮০০	অষ্টাদশ
১৮০১ — ১৯০০	ঊনবিংশ
১৯০১ — ২০০০	বিংশ
২০০১ — ২১০০	একবিংশ

* সূত্র : ১. কলিন্স কোবিল্ড ইংলিশ ডিকশনারি, হারপার কলিন্স পাবলিশার্স, লন্ডন। পুনর্মুদ্রণ—১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ২৫৭

২. নিউ ওয়েবস্টার্স ডিকশনারি অ্যান্ড থিসোরাস, লেক্সিকান পাবলিকেশনস ইনকরপোরেটেড। মুদ্রণ : ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ১৬০

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য



ভারতীয় সংসদ ভবন, দিল্লি

মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

১. সাম্যের অধিকার

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনও নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার
- অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ
- খেতাব ব্যবহার করা যাবে না

২. স্বাধীনতার অধিকার

- বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার
- সঙ্ঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার
- ভারতের যে কোনও স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার
- যে কোনও জীবিকা, পেশার বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার
- আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে শুধুমাত্র প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে
- একই অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না
- কোনও অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার
- যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

- কোনও ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনও বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে
- প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে
- কোনও বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনও ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না
- সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র বা ছাত্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার

- সকল শ্রেণীর নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

- মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ৫১এ)

১। সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ

২। মহৎ যে সব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা

৪। আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা

৫। ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্বোধন

৬। দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ

৭। অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণিজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ

৮। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারপ্রবণতার বিকাশ

৯। সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা

১০। জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা

এ দেশ তোমার—একে সুন্দর রাখার দায়িত্ব তোমার।
গাছপালা আমাদের বন্ধু। এদের যত্ন নাও।

B.C.L

सत्यमेव जयते

000096

No. 2000-H-III